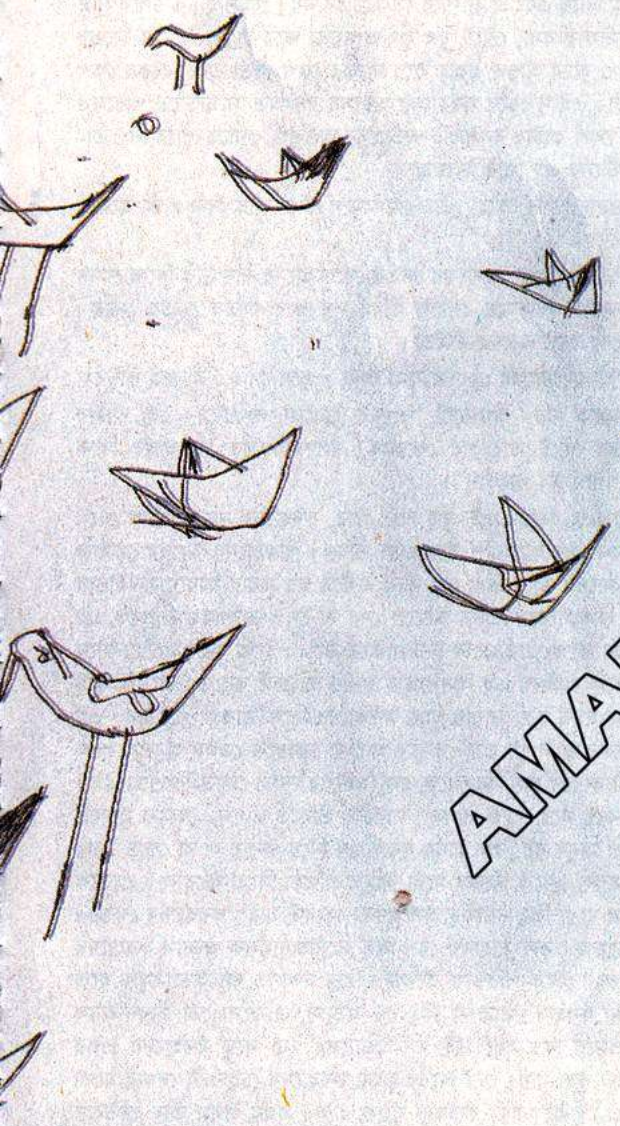

উপন্যাস

হৃদয়নদী

হরিশংকর জলদাস

AMARBOI.COM

ডানহাতের তালুতে চিবুকটা রেখে সামনের তাকিয়ে আছে পারভীন। কিন্তু নজর তার বেশিদূর এগোতে পারছে না, আঁধারে ঢাকা পড়ছে।

ভোরের আজান পড়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। এই সময়ে আলো-আঁধারে যুদ্ধ চলে। আঁধার শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও আলোকে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না সহজে। এরকম একটা সময়ে পারভীন আক্তার বিছানা ছেড়ে সমুদ্রমুখী বারান্দায় এসে বসেছে। সেন্টমার্টিনের ব্লু মেরিনের তে-তলার এই বারান্দাকে মৃদু সমুদ্র-হাওয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। দূরে হঠাৎ কোকিল ডেকে উঠল, কু-উ।

বহুদিন পরে পারভীন কোকিলের ডাক শুনল। গেল প্রায় চল্লিশ বছর ইটকাঠের শহুরে জীবন তার। বুক কাঁপানো গাড়ির আওয়াজ বা কাকের কর্কশ কণ্ঠের শব্দে সকালের ঘুম ভাঙে তার। স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে বা ফরহাদের গতরাতের অক্ষমতার কারণে আযান-ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে তার। ভাগ্যিস, ঘুম ভেঙেছিল! নইলে ভোরের এই আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব, কোকিলের এই মর্মছোঁয়া কণ্ঠ শুনতে পেত না সে।

সকালটা ফুটি ফুটি করছে। পারভীন আক্তারের দৃষ্টি জলরাশি পর্যন্ত প্রসারিত হলো। সামনে সমুদ্র, অথৈ নীলজলের বঙ্গোপসাগর। শান্ত জল বয়ে চলেছে। পারভীন বুঝতে পারছে না এখন জোয়ার না ভাটা। সে শুনেছে, সেন্টমার্টিনের এই অংশে যদি জোয়ার হয়, তাহলে স্রোত দক্ষিণ থেকে উত্তরে যায়, আর যদি ভাটা হয়, তাহলে উত্তর থেকে দক্ষিণে। জোয়ারই হবে বোধহয় এখন। কূলে জলের আছড়ে পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে–জোয়ারই লেগেছে বঙ্গোপসাগরের স্রোতে।

অলংকরণ : চন্দ্রশেখর দে

বঙ্গোপসাগর। শান্ত জল বয়ে চলেছে। পারভীন বুঝতে পারছে না এখন জোয়ার না ভাটা। সে শুনেছে, সেন্টমার্টিনের এই অংশে যদি জোয়ার হয়, তাহলে স্রোত দক্ষিণ থেকে উত্তরে যায়, আর যদি ভাটা হয়, তাহলে উত্তর থেকে দক্ষিণে। জোয়ারই হবে বোধহয় এখন। কূলে জলের আছড়ে পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে—জোয়ারই লেগেছে বঙ্গোপসাগরের স্রোতে।

সূর্য ওঠে নি এখনো। কিন্তু একধরনের স্নিগ্ধ আলো পুবের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোকে ঘিরে তিন-চারটি কালোমেঘের ঢেউ উঠানামা করছে। এক ঝাঁক গাঙচিল উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে গেল। এই সময় কোকিলটা আবার কু-উ করে ডেকে উঠল। পারভীন আক্তার নড়েচড়ে বসল। এই সময় হঠাৎ করে তার চট্টগ্রাম কলেজের কথা মনে পড়ল, বাংলা বিভাগের দেয়াল ঘেঁষে উঠা কৃষ্ণচূড়া গাছের কথা মনে পড়ল, পুষ্পিত ডালে বসা কুহুরত কোকিলের কথা মনে পড়ল। পারভীন আক্তার তার শরীরে একটা সুতীব্র চাঞ্চল্য অনুভব করতে লাগল। এ চাঞ্চল্য ব্যথার না আনন্দের তা সে বুঝে উঠতে পারল না। চাঞ্চল্যের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে এলে পারভীন তার মনে একধরনের আনন্দের উপস্থিতি টের পেল। এ আনন্দ অপার, অভাবিত, অ-অনুভূতিপূর্ব।

এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিষ্পলক চোখে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল। গত সপ্তাহে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে পারভীন আক্তার। গলার চামড়ায় সামান্য ভাঁজ পড়েছে শুধু, তাও ভালো করে তাকালেই বোঝা যায়। এ ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও টোল খায় নি। পেলব বাহু, মসৃণ কপোল, দীর্ঘ আঙুল, নখ—সবই মনোলোভা। গোলাকার মুখ, অধর ঈষৎ ছড়ানো। ছোট নাসিকাটি ওষ্ঠের একটু উপরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। শত্রুরা বলবে—বোঁচা নাক পারভীনের। রসিকরা বলবে—নাকের এরকম গড়ন না হলে পারভীনকে যথার্থ সুন্দরীই বলা যেত না। কালো ফ্রেমের চশমাটি তার চোখকে নীল সমুদ্রের গভীরতা দিয়েছে।

পারভীন ক্লিপে আটকানো চুল দু'কাঁধে ছড়িয়ে দিল। এতে তার গোল, ঈষৎ চোয়াল-উঁচু মুখটার সৌন্দর্য বেড়ে গেল অনেক গুণ। সোনালি, কোঁকড়ানো ববকাট চুল পারভীনের। নিজের চেহারা দেখে আজ এই স্নিগ্ধ সকালের হোটেল কক্ষে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল পারভীন। আঁচল একটু আলগা করে ডানদিকে কাত হয়ে নিজের স্তনের দিকে তাকাতে গিয়ে ফরহাদের ওপর চোখ পড়ল পারভীনের। মনটা সামান্য বিষণ্ন হয়ে গেল তার; মনে ও শরীরে একটু আগে যে আনন্দ অনুভব করছিল, তাতে যেন একটু খামতি দেখা দিল।

ফরহাদ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। পরনে কালো গেঞ্জি এবং পাতলা কাপড়ের একটি ট্রাউজার পরেছে সে। জানালা দিয়ে আসা সকালের সূর্যের আলোতে একরাতের অকর্তিত সাদা দাড়ি চিকচিক করছে। মোটা গোঁফ ফরহাদের। সেই গোঁফে কলপ লাগায় ফরহাদ। মাথায় হালকা চুল—কাঁচাপাকা। মৃদু তালে শ্বাস ফেলছে ফরহাদ। নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে গুটি কয়েক কাঁচাপাকা কেশ শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপে একবার বেরোচ্ছে, আরেকবার ঢুকছে। নাসিকাকেশের এই চলাচল দেখে পারভীনের গা রি রি করে উঠল। বিয়ের পর থেকে নাকের কেশ কেটে ভদ্রগোছের জীবনযাপন করার ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে অনেকবার কথা হয়েছে। একদিন কথা থেকে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়ে যায়।

বিয়ের পর বছর দু'য়েক পেরিয়ে গেছে। এক সকালে গোসল করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে ফরহাদ। উদোম গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুলে তোয়ালে ঘষছিল সে। আয়না থেকে একটু সরে গিয়ে পারভীন আঁচল ঠিক করছিল। এর আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করেছে সে। মনে ফুরফুরে ভাব। আঁচল ঠিক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারভীনের চোখ পড়ল ফরহাদের নাকের ওপর। বেশ কয়েকটি ভেজা নাসিকাকেশ ছিদ্রপথের বাইরে ওষ্ঠের ওপর শিথিলভাবে শুয়ে আছে। ওগুলো দেখেই পারভীনের মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল।

প্রায় গর্জন করে পারভীন বলল, তুমি আর ভদ্রগোছের হলে না ?

ফরহাদ থতমত খেয়ে বলল, আমার মধ্যে আবার অভদ্রগোছের কী দেখলে ?

প্রতিবার কি তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে ?

বিয়ের ক'মাসের মাথায় পারভীন বুঝে গেছে যে, ফরহাদের মধ্যে কিছু গেঁয়োমি আছে এবং এ ব্যাপারে সে সচেতন নয়। যেমন হাঁটুর ওপরে লুঙ্গি তুলে সোফায় বসা, ঠোঁটে ফুৎ ফুৎ আওয়াজ করে চা খাওয়া, বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল একত্র করে নাকের কেশ ছেঁড়া এবং নাকের কেশ না কাটা। এই দু'বছরে ফরহাদের অন্যসব বদ-অভ্যাস ছাড়াতে পারলেও নাকের কেশ কাটার ব্যাপারটি অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত করাতে পারে নি। তা-ই পারভীনের এই তিরিক্ষি মেজাজ।

ফরহাদ বলল, আহা, এত রেগেমেগে কথা বলছ কেন ? কী হয়েছে বলবে তো!

কী হয়েছে মানে ? নাকের ভেতর থেকে ধানের শীষ উঁকি দিচ্ছে যেমন করে সন্ধ্যালাগা সময়ে শেয়াল উঁকি দেয় তার গর্তের ভেতর থেকে। পারভীনের কণ্ঠে আগের উষ্ণতা।

ও আচ্ছা, নাকের কেশের কথা বলছ ? ভুলে গেছি। কালকে কাটব।

কালকে নয়, আজকেই, এখনই ঢোকো বাথরুমে, ওই ঝাঁটার শলাগুলো কেটে তার পর বেরোবে। বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল পারভীন।

আজকে, বিয়ের এই এত বছর পরে, ফরহাদের নাকের কেশ দেখে পারভীনের মনটা খারাপ হয়ে গেল ভীষণ। পারভীনের আগের মেজাজ নেই, বয়সের ভারে এবং বহু বছর একত্রে ঘর করার কারণে ফরহাদের অনেক অসংগতিকে এখন আমলে নেয় না সে। তারপরও আজকে এই সুশোভন কক্ষে তার মনটা টনটন করে উঠল। ইচ্ছে করল—ঠেলা দিয়ে ফরহাদকে জাগিয়ে এই অসভ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করতে। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে আবার ঘুমন্ত ফরহাদের দিকে তাকাল পারভীন। এই সময় কেন জানি সে তার ভেতরে আগের ক্রোধকে তেমন অনুভব করল না। কী কারণে যেন মন থেকে একটু আগের সকল ক্ষোভ-বিষণ্নতা একটু একটু করে সরে যেতে লাগল। পারভীন ভাবতে লাগল—কোনো মানুষই তো পূর্ণ মানুষ নয়। সব মানুষ সকল গুণ নিয়ে জন্মায় না বা বেড়ে উঠার পরও সকল গুণকে নিজের মধ্যে আমূল প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। ফরহাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার সাহচর্যে বেশ কিছু অসৌজন্যমূলক অভ্যাস ফরহাদের জীবনাচরণ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণত বদ-অভ্যাসমুক্ত হতে পারে নি ফরহাদ। থাক না কিছু বদ-অভ্যাস, এ জন্যে তো জীবন অচল হয়ে পড়ছে না! বরং এই বদ-অভ্যাসের সূত্র ধরে ফরহাদের ওপর চোটপাট করা যায়। চোটপাটের সময় ফরহাদের চেহারাটা দেখার মতো হয়ে ওঠে। একেবারে কাঁচুমাচু যাকে বলে। প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করত ফরহাদ, তার এইসব বদ-অভ্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে চাইত। কিন্তু তার চাপে এই সব ঠুনকো যুক্তি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত। তখন বড় অসহায় দেখাত ফরহাদকে। বিষণ্নতা ও বিপর্যস্ততা তার মুখকে ফ্যাকাসে করে তুলত। সে সময় ফরহাদের ওপর বড় মায়া হতো পারভীনের। মনে হতো—আহারে! ফরহাদকে এরকম না বকলেও

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা
বাংলার রস | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

চলত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত—আর না, আর কোনোদিন ফরহাদকে বকবে না সে।.

কিন্তু পারভীনের ভেতরে গত রাত থেকে প্রচণ্ড একটা অভিমান দলা পাকিয়ে আছে। হয়তো সেই অভিমান এই সকালে রাগের বেশ ধরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।

একটা কলেজে অধ্যাপনা করে পারভীন, বিভাগীয় প্রধান। ওই কলেজের সকল শিক্ষক বছরে একবার বেরিয়ে পড়েন। কোনো বছর সমুদ্রের দিকে, কোনো বছর পাহাড়ের দিকে তাঁরা পাড়ি জমান। এবার প্রায় শতাধিক শিক্ষক তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সেন্টমার্টিনে এসেছেন। দু'রাত থাকবেন তাঁরা এ দ্বীপে। ব্লু মেরিন হোটেলে উঠেছেন সবাই। পারভীন-দম্পতির জন্য সমুদ্রমুখী এই তৃতীয় তলার কক্ষটি নির্ধারণ করা হয়েছে। পারভীনের দুই ছেলে, এক মেয়ে। ওরা বড় হয়েছে। বড়ছেলের সদ্য বিয়ে দিয়েছে পারভীন, মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে। ছোটছেলে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ফরহাদ, পারভীনের স্বামী একটি প্রাইভেট ফার্মের বড় অফিসার ছিল। বছরখানেক হলো চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্টে গেছে। বড়সাহেব হওয়ার কারণে বা পারভীনের প্রতিক্ষণের চাপাচাপিতে ফরহাদের মধ্যে একধরনের রুক্ষ মেজাজ জায়গা করে নিয়েছে। তবে সে মেজাজ ফরহাদ ঘরে যত না দেখাত, তার চেয়ে শতগুণ বেশি দেখাত অফিসে। অফিসের অধস্তন কর্মচারীরা সর্বদা তটস্থ থাকত। ফরহাদের চাকরি গেলেও তিরিক্ষি মেজাজ যায় নি। সময় ও সুযোগ পেলে তার মেজাজ নখদন্ত বিস্তার করে। চারপাশের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে তার অসহিষ্ণু মোজই যথেষ্ট।

গেল ক'বছর ধরে পারভীন ফরহাদের মধ্যে শারীরিক অক্ষমতার ব্যাপারটি লক্ষ করছে। পারভীনের আহ্বানে ফরহাদ তেমন করে সাড়া দেয় না আজকাল। বিয়ের পর পারভীন ফরহাদের মধ্যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা দেখেছে। বয়সের কারণে সেই ক্ষুধা ধীরে ধীরে কমে এলেও একেবারে ভাটা লাগে নি। কিন্তু বিগত ক'বছরে সেই ক্ষুধা একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। কেন জানি, একধরনের দূরত্ব সৃষ্টি করে একটি অদৃশ্যমান দেয়াল তুলেছে এটি দুজনের মধ্যে। পারভীন প্রথম প্রথম ভাবত—হয়তো বয়ঃবৃদ্ধির কারণে ফরহাদের মধ্যে এই উদাসীনতা তৈরি হয়েছে। অথবা কাজের চাপে শারীরিক চাহিদার ব্যাপারটি হয়তো স্তিমিত হয়ে পড়েছে। পারভীন বিশ্বাস করেছে—এ উদাসীনতা বা অনীহা কিছুদিনের জন্য। একটা সময়ে ফরহাদ ক্লান্তিমুক্ত হয়ে চাঙা হয়ে উঠবে, ক্ষুধার আগুন দিয়ে তার দেহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে থাকবে। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরেও পারভীন অবাক হয়ে দেখল তার বিশ্বাস বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না। একধরনের ম্রিয়মাণতা, একধরনের বিপন্নতা, কখনো কখনো ভীষণ একটা বিষণ্ণতা ফরহাদকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। রাতে পারভীন শিথিল পরিধেয়কে আরও শিথিল করে ফরহাদের ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে ফরহাদ হয় বড় বড় চোখ করে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, নয় ঘুমের ভান করে হঠাৎ নাক ডাকা শুরু করেছে অথবা কোনো উপন্যাসে নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছে। পারভীন ডান হাত দিয়ে ফরহাদকে কাছে টানলে অসহায় মুখে বলেছে, পারভীন, উপন্যাসটির মজার একটা অংশে এসে পৌঁছেছি, এ অংশটা পড়তে না পারলে মনটা আঁকুপাকু করবে, উপন্যাসটা পড়ি, হ্যাঁ। আরেক দিন হবে।

অভিমানে হাত সরিয়ে নিয়েছে পারভীন। পাশ ফিরে কোলবালিশ টেনে নিয়েছে।

আবার যেদিন ঘুমের ভান করেছে ফরহাদ, সেদিন স্পষ্ট বুঝে গেছে পারভীন—এ ফরহাদের অভিনয়। সেদিন চিৎ হয়ে শুয়ে পারভীন সোজা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কামের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে এলে পাশে শুয়ে থাকা ফরহাদের দিকে তাকিয়েছে পারভীন। ঘরের নীল আলোয় দেখেছে—ফরহাদ তার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। সে সময় ফরহাদকে কিছু জিজ্ঞেস করার তাগাদা ভেতর থেকে অনুভব করে নি পারভীন। শুধু অভিমান ভরা চোখে ফরহাদের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। মাঝে মধ্যে পারভীন ভেবেছে, তাকে অবহেলা দেখাচ্ছে না তো ফরহাদ! কোনো কারণে রুষ্ট হয় নি তো সে তার ওপর! তার শারীরিক সৌষ্ঠব, তার পেলবতা, তার স্তনের পুষ্টতা, তার অধরের লালিমা, তার কটাক্ষের ধার কি অবহেলা করার মতো কমে এসেছে?

যে-রাতে ফরহাদ সত্যিকারভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, সে-রাতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় পারভীন। বুক থেকে আঁচল সরিয়ে নেয়। দেখে—তার স্তন এখনো বিম্বফলের মতো পুষ্ট, গোল। সন্তান হয়েছে তিনটি তার, সন্তান প্রসবের প্রভাব তার স্তনে তেমন কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। কালিদাসের নায়িকার মতো স্তন দুটো ঈষৎ ঝুঁকেছে শুধু। এই ঝোঁকা তার স্তনযুগলের সৌন্দর্যহানি ঘটায় নি, বরং ব্যক্তিত্ব বাড়িয়েছে। পারভীন তার বাহু দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। সেই আধো আলো আধো আঁধারের ঘরেও তার বাহুযুগল কামের আলো ছড়ায়। একটু বেঁকে পিঠ দেখে পারভীন, গ্রীবা দেখে। দেখে দেখে নিজেই পুলকিত হয় পারভীন। আহা! এত বয়সেও তার দেহ এত লোভনীয় থেকে গেছে!

গতরাতে গর্জনশীল সমুদ্রকে শিয়রে রেখে দরজা বন্ধ করেছিল পারভীন। হোটেলের ডাইনিংরুমে খাওয়া সারতে সারতে রাত বেশ গভীরই হয়ে গিয়েছিল। তিন ব্যাচ পরে খেতে বসেছিল পারভীন-দম্পতি। একই টেবিলে বসেছিল অর্থনীতি বিভাগের হুমায়ুন কবীর। গত মাসে বিয়ে হয়েছে তার। বউকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে হুমায়ুন। মুখোমুখি বসেছে দুজনে। চিরুরে কথা বলছে আর এর প্লেটের মাছ ওর প্লেটে, ওর প্লেটের মাংস এর প্লেটে তুলে দিচ্ছে। বউটির সোহাগি চাহ নি। আর হুমায়ুনের চোখ ঘুরে ফিরছে বউটির গলায়, গলার নিচের খোলা অংশে, কপোলে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার চোখ পারভীনের। হুমায়ুনের চোখ তার ভেতরের ধিকি ধিকি কামনাকে জানান দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, খাওয়াটা তার কাছে গৌণ, কক্ষে দ্রুত পদার্পণই তার কাছে এখন মুখ্য বিষয়। এবার সোজা চোখে ফরহাদের দিকে তাকায় পারভীন। দেখে মাংসের একটা অংশ দাঁতে চেপে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় গভীরভাবে মগ্ন ফরহাদ। তার অন্যকোনো দিকে খেয়াল নেই। মাংস-বিচ্ছিন্ন করাটাই যেন তার ধ্যান আর জ্ঞান।

রুমে ফিরে রাতের ড্রেস পরল দুজনে, তারপর বারান্দায় গিয়ে বসল। রাতটা পূর্ণিমার কাছাকাছি হবে বোধহয়। জোছনায় বেলাভূমি, তীরলগ্ন বাড়িঘর, বাড়ির আশপাশের নারকেল গাছের মাথাগুলো ভেসে যাচ্ছে। চারদিক শুনশান। ঢেউয়ের মৃদু গর্জন শুধু ভেসে আসছে। খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে পারভীন আর ফরহাদ। পারভীনের হাত ফরহাদের হাতে।

ফরহাদ বলল, কতগুলো বছর কেটে গেল, তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে ফরহাদের প্রশ্নের উত্তর দিল না পারভীন। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পারভীন বলল, হ্যাঁ, অনেকগুলো বছর, প্রায় তেত্রিশ বছর।

তাই নাকি? সে রকম করে তো হিসেব রাখি নি! ফরহাদ বলল।

হিসেব তো তোমারই রাখার কথা। যোগ-বিয়োগ নিয়েই তো দিন কেটেছে তোমার। আমি বাংলা পড়াই। আমার তো অঙ্কের হিসেবটা মাথায় রাখার কথা নয়। মৃদু কণ্ঠে বলল পারভীন।

সত্যি, জীবনটা অঙ্ক কষাকষিতে কেটে গেল। তোমার দিকে তেমন করে তাকাবার সময় পাই নি।

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

একসময় তুমি তাকাতে আমার দিকে, খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাতে। মৃদু অভিমান পারভীনের কথায় মিশে আছে।

ফরহাদ একটু থতমত খেয়ে গেল। নিচুস্বরে বলল, এখন তাকাই না?

না, তাকাও না। আগে আমার প্রতি তোমার যে মনোযোগ ছিল, যে আকর্ষণ ছিল—তা শূন্যে এসে ঠেকেছে বলে আমার মনে হয়। অভিমানের সঙ্গে অভিযোগ যুক্ত হয়েছে পারভীনের কণ্ঠে।

বয়স হয়েছে না আমাদের! বয়সের ভারে হয়তো শরীরের টানটা কমেছে, কিন্তু মনের টান কি কমেছে? তোমার প্রতি? নরম সুরে কথাগুলো বলে গেল ফরহাদ।

মনের টানের কথা বুঝি না। মনকে তো দেখা যায় না! কিন্তু আমার জন্য তোমার শরীরে জোয়ারের কোনো টান আসে বলে আমার মনে হয় না। তোমার কাছে আমার দেহের কোনো দাম নেই। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে পারভীন বলে।

রাগ করো না লক্ষ্মীটি। ফরহাদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পারভীনের ডান হাতটি নিজের দিকে টেনে নেয়। বাঁহাতে জড়িয়ে পারভীনকে বুকের কাছে টানে ফরহাদ। বিছানার কাছাকাছি যায়।

তারপর উন্মাদ হয় দুজনে, ফরহাদের তুলনায় পারভীনের উন্মাদনা বেশি।

এই সময় বাইরের দরজায় ধুকধুক আওয়াজ হয়। বিরক্ত কণ্ঠে পারভীন জিজ্ঞেস করে, কে?

আমি আফা, কালাম। এই হোটেলের নাইট গার্ড।

কী চাই?

কিছু চাই না আফা। মনে করাইয়া দিতে আসছি।

কী এমন ভুলে গেছি যে মনে করিয়ে দিতে এসেছ? ফরহাদের ঠোঁটে মুখে উষ্ণতা ছড়াতে ছড়াতে পারভীন জিজ্ঞেস করে।

রাত বারটায় কারেন চলি যাইব। বারটা বাইজতে আর দশ মিনিট বাকি আছে। দরজার সামনে হারিকেনটা জ্বালানো আছে। হারিকেনটা সরে ঢুকাইয়া নেন।

চোখে মুখে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে পারভীন উঠে দাঁড়াল। গায়ের শিথিল কাপড় টেনেটুনে ঠিক করল। দরজা খুলে হারিকেনটা নিচে গিয়ে দেখল কালাম পাশের রুমে টোকা দিচ্ছে। হারিকেনটা টেবিলে রেখে পারভীন বিছানায় এল। ফরহাদের মুখের দিকে খেয়াল নেই পারভীনের। সে আবার খেলায় মেতে উঠল। দীর্ঘদিনের ক্ষুধার্ত শরীর। আজকে তার সকল হিসেব-নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চায় পারভীন। অফুরান উষ্ণতা নিয়ে ফরহাদের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর মিশিয়ে দিতে চায় আজ পারভীন। আগের আবেগ নিয়ে সে ফরহাদের শরীরের ভাঁজে ভাঁজে হাত ঠোঁট বুলাতে থাকে।

কিন্তু একসময় পারভীনের হঠাৎ খেয়াল হলো, ফরহাদের মধ্যে একটু আগের উষ্ণতা খুঁজে পাচ্ছে না তো সে! একধরনের শিথিলতা যেন তার শরীরের আনাচে কানাচে! হাত নিষ্ক্রিয়, ঠোঁট নিস্তেজ, বুকের স্পন্দন যেন কী কারণে থেমে গেছে! হারিকেনের মৃদু আলোয় পারভীন ফরহাদের মুখের দিকে তাকাল। দেখল, ফরহাদ অসহায়ভাবে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ হাউমাউ করে উঠল ফরহাদ, পারভীন, তুমি আমাকে মাফ করো, ক্ষমা করো আমাকে। আমি পারব না, আমি অক্ষম, আমি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছি পারভীন।

পারভীনের সকল আবেগ মুহূর্তেই থেমে গেল। তার সমস্ত শরীর আবেগহীন পাথরে রূপান্তরিত হলো। ফরহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পারভীন ধবধবে সাদা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

ফরহাদের মৃদু নাকডাকার শব্দ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে যেতে লাগল একসময়।

এ সময় নিখিলেশের কথা খুব করে মনে পড়ল পারভীনের। হায় নিখিলেশ, তুমি এখন কোথায়? সেই যে কোনো কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেলে তুমি! তোমার কি একবারও জানতে ইচ্ছে করে না—আমি কেমন আছি?

পারভীন শরীরটাকে টেনে টেনে শ্লথ পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাইরে তখন জোছনার প্লাবন। জোছনা পারভীনের ভেতরের হাহাকারকে আরও তীব্র করে তুলল। রেলিং ধরে পারভীন মৃদু কণ্ঠে বলে যেতে লাগল—

আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কি মানুষজন্ম? নাকি শেষ
পুরোহিত—কঙ্কালের পাশা খেলা! প্রতি সন্ধেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত; আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি—তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখব বলে। আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে।

আবৃত্তি করতে করতে ভেঙেচুরে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে পারভীন। রেলিংয়ে ছড়ানো দু'বাহুতে মাথাটা নুইয়ে আসে তার।

সামনে একটু দূরের বেলাভূমিতে, প্রবল তরঙ্গ তখন আছড়ে পড়ছে।

দুই

অনেকক্ষণ পর বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এসেছিল পারভীন। ফরহাদ তখন পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছে, বেঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুমানো অভ্যেস ফরহাদের। হোটেলে কোলবালিশের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফরহাদ কম্বলকে গোলাকার করে কোলবালিশের রূপ দিয়েছে। তা-ই জড়িয়ে বাঁ পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছে সে।

বিছানার পাশে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল পারভীন, তারপর আলতো করে ফরহাদের পাশে শুয়ে পড়ল। একবার মনে হলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে নখের আঁচড়ে আঁচড়ে ফরহাদকে রক্তাক্ত করতে পারলেই বুঝি সুখ। ইচ্ছে হলো ফরহাদকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে, ঘুমাতে তোমার লজ্জা করে না? অক্ষম শরীর নিয়ে বউয়ের পাশে ঘুমানোর অধিকার তোমার নেই। তুমি নেমে যাও এখান থেকে, এই বিছানা থেকে।

কিন্তু বাস্তবে কিছুই করল না পারভীন, কিছুই বলল না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল ফরহাদের পাশে। তীব্র চোখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল পারভীন।

ছোটবেলা থেকে চিৎ হয়ে ঘুমানোর অভ্যেস পারভীনের। এ নিয়ে মায়ের কত বকুনি শুনতে হয়েছে পারভীনকে!

মা বলত, শোন পারভীন, মেয়েদের চিৎ হয়ে শোয়া ভালো নয়।

কিশোরী পারভীন জিজ্ঞেস করত, কেন মা, কেন ভালো নয়?

আমি তোকে অতশত বোঝাতে পারব না। শুধু শুনে রাখ, মেয়েদের চিৎ হয়ে শুতে নেই। মেয়েদের অক্র থাকে না এতে। মা বলত।

অবুঝ পারভীন বলত, বাবা শোয় চিৎ হয়ে, ভাইয়েরা শোয় চিৎ হয়ে, যত দোষ

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রুচি | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

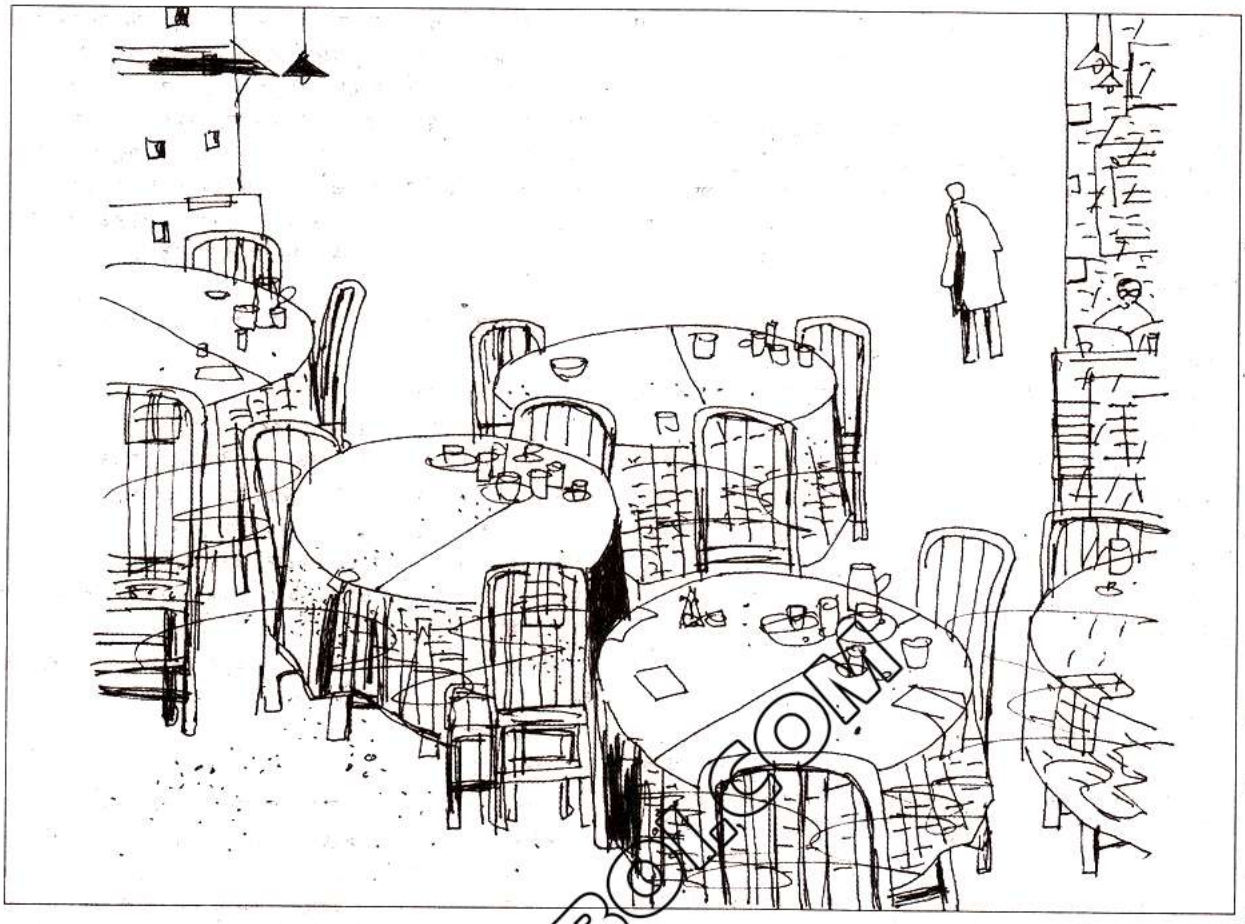

AMARBOI.COM

শুধু মেয়েদের, না ? মেয়েরা চিৎ হয়ে শুলেই যত দোষ তোমার চোখে ধরা পড়ে!

মা রেগে যেত। কঠিন কণ্ঠে বলত, নির্লজ্জ তুই। আমার অন্য মেয়েরা যা বলি তা-ই মেনে নেয়। তুই মুখে মুখে তর্ক করিস। সেয়ানা হয়ে উঠেছিস তুই, বুঝিস না কিছু ?

মায়ের কঠোর কণ্ঠ শুনে ভড়কে যায় পারভীন। পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে, বুঝি না কিছু, কেন যে ধমকা ধমকি করো!

মা পাশে আসে। পারভীনের কপালে চুলে হাত বুলায়। নরম কণ্ঠে বলে, এখন বুঝবি না মা। ঘরে তোর ভাইয়েরা আছে। একটু নিয়ম কানুন মেনে চল মা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর যখন মেয়ে হবে তখন সব কিছু খোলসা হয়ে যাবে তোর কাছে।

পারভীন মাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলে, ধ্যাৎ, কী যে পচা কথাবার্তা বলো না মা তুমি! আমার মেয়ে হবে!

মা হাসতে হাসতে দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, তোর একটা মেয়ে হবে, তোর থেকেও সুন্দরী একটা মেয়ে হবে তোর। দেখে নিস তুই, আমার কথা সত্যি হবে।

ফরহাদের পাশে এই বিক্ষুব্ধ সময়ে শুয়েও মুচকি হেসে ওঠে পারভীন। মায়ের কথা ফলেছে। বড়ছেলের পর জন্মাল হেমলতা। স্বর্ণালি রং মেয়েটির। ফরহাদ তো খুশিতে আটখানা। বলত, আমার ঘরে আর আলো জ্বালাতে হবে না। হেমলতার আলোতে ঘরের সব আঁধার কেটে যাবে।

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

হেমলতা পারভীনের মেয়ের আসল নাম নয়। আসল নাম হাসনা-তুজ-জাহারিয়া। হাসনার গায়ের রঙ হেমলতার মতোই স্বর্ণাভ। পারভীন মেয়েটার কোমল গালে নিজের গাল ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, ওরে আমার আলোরে, ওরে আমার সোনারে! তুই আমার স্বর্ণলতা, তুই আমার হেমলতা।

ওই থেকে পরিবারের সবাই হাসনাকে হেমলতা বলে ডাকতে শুরু করল। আর পারভীন—ফরহাদ ডাকতে লাগল লতা বলে।

ওই কৈশোর বয়সেই পারভীন একদিন মা-বাবার কথোপকথন শুনতে পেল। মা-বাবার ঘরেই শুধু অ্যাটাচড টয়লেট। ভাইবোনদের জন্য কমন টয়লেট। বাবা-মায়ের রুমের পাশ দিয়ে ওই টয়লেট যেতে হয়। একরাতে টয়লেট সেরে ফিরবার সময় পারভীন বাবার গলা শুনতে পেল।

বাবা বলছে, তুমি পারভীনকে এত বকাঝকা করো কেন ? না হয় মেয়েটি চিৎ হয়ে শোয়। চিৎ হয়ে শুয়ে যদি ও আরাম পায়, তা-ই করতে দাও না তাকে।

তুমি এসব কী বলো ? চিৎ হয়ে শুলে মেয়েরা বেআব্রু হয়ে যায় না ? মেয়েমানুষের সকল কিছু তো সামনের দিকে। ছোটবেলা থেকে ওইসব বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানো আমার পছন্দের না। মা কঠিনগলায় কথাগুলো বাবাকে বলে গেল।

বাবা কী যেন বলল মাকে। কিন্তু পারভীনের কান দিয়ে বাবার কথা ঢুকল না। মায়ের কথায় পারভীনের মাথা ঝাঁ ঝাঁ

করে উঠল— মেয়েমানুষের সকল কিছু তো সামনের দিকে। নিজের অজান্তে কচি স্তনে হাত উঠে এল তার। ও তাহলে মা এই ব্যাপারটাই বোঝাতে চাইছে বারবার!

সেই থেকে মায়ের আগমন টের পেলে কাত হয়ে শুতো পারভীন। মা চলে গেলে যেই কে সেই। চিৎ হয়ে না শুলে যে পারভীনের ঘুম আসে না। হেমলতাও তার স্বভাবটি পেয়েছে। ছোটবেলায় কাত করে ঘুম পাড়ালে সে ঘুমাত না। যেই না চিৎ করে শোয়ানো হল লতাকে, অমনি মৃদু নাকডাকা শুরু করল। হেমলতা রূপ পেয়েছে মায়ের, আর নাক ডাকা স্বভাবটি পেয়েছে বাপের কাছ থেকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে পারভীনের মনটি নরম হয়ে এসেছে টের পায় নি। প্রশান্ত মন নিয়ে একসময় ঘুমিয়ে গেল পারভীন। ঘুম ভাঙার পর নিজের ভেতরে তাকিয়ে দেখল পারভীন—সেখানে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ এই মুহূর্তে জমা নেই।

রাতের সকল অভিমান-ক্ষোভ-বেদনাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে নতুন দিন শুরু করল পারভীন। আলতো করে ধাক্কা দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে ফরহাদকে জাগাল সে। ফরহাদ চোখ মেলে তাকালে পারভীন বলল, শিগগির তৈরি হয়ে নাও। সবাই নেমে গেছে সীবিচে। বারান্দায় এসে দেখ—কেউ কেউ বালি ছুড়ছে এর ওর গায়ে, কেউ জলে দাপিয়ে সাঁতার কাটছে। চল চল আমরাও যাব।

ফরহাদ হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে, আমি না গেলে হয় না!

কী যে বলো তুমি, এখানে এসেছি আমরা একটু অন্যরকম জীবনযাপন করতে। রুটিনবাঁধা গণ্ডি থেকে বেরিয়ে জীবনকে পেছন ফিরে দেখবার জন্যেই মানুষ বনে-পাহাড়ে, সমুদ্রে-মরুতে যায়। আমরাও এসেছি জীবনকে এই সমুদ্রতলে খুলে মেলে দেখতে। উচ্ছ্বাসে ভরা পারভীনের কণ্ঠ।

ফরহাদ নরম গলায় বলল, যেতেই হবে তাহলে ? এই বয়সে সমুদ্রজলে নামা কি শোভন হবে ?

পারভীন ফরহাদের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে বারান্দায় নিয়ে এল ফরহাদকে। বেলাভূমির দিকে হাত প্রসারিত করে বলল, ওই, ওই যে হাফপ্যান্ট পরা ভদ্রলোককে ফেনাজলে ঝাঁপাঝাঁপি করতে দেখছ, উনি কে চিনতে পারছ ? চিনতে পারছ না ? উনি হলেন আমাদের প্রিন্সিপালের হাজবেন্ড। বছরচারেক হয়ে গেছে ভদ্রলোক রিটায়ারম্যান্টে গেছেন। ওই বয়সেও কেমন জলকেলি করছেন দেখতে পারছ তো ? ওই যে পাশের নারীটি, সেলোয়ার কামিজ পরা, তিনি আমাদের অধ্যক্ষ। যদিও তিনি সেলোয়ার কামিজ পরে ম্যাডামদের কলেজে আসা নিষেধ করেছেন, সেন্টমার্টিনের এই সীবিচে এসে তিনি কিন্তু নিজের তৈরি আইনকে ভুলে গেছেন। তো, তাঁরা যদি জীবনকে ওভাবে উপভোগ করতে পারেন, আমরা পারব না কেন ? পারভীনের শেষের দিকের কথায় একটু ঝাঁজ টের পাওয়া যায়।

ফরহাদ সেটা বুঝতে পারে। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে টয়লেটের দিকে যেতে যেতে বলে, আমাকে দশ মিনিট সময় দাও, আমি তৈরি হয়ে আসছি।

গলাজলে দু'জনে মুখোমুখি—পারভীন ও ফরহাদ। মৃদু ঢেউ তাদের শরীরে দোলা দিচ্ছে। আশপাশে আরও বেশ কয়েকটি দম্পতি জলে নেমেছে। কারও কারও সঙ্গে আবার কচিকাঁচারাও আছে। একটু দূরের বেলাভূমি থেকে ছোটবড় বাচ্চাদের হৈ-হল্লা ভেসে আসছে। কেউ কেউ হাত ধরাধরি করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের নীলজল, বালির বেলাভূমি, বেলাভূমির মাঝখানে মাঝখানে মাথা-উঁচু প্রবাল, ঢেউয়ের মৃদু দোলা—এসব কিছু মিলে পারভীনের মধ্যে এক নিবিড় আবেগের সৃষ্টি হলো। তার চারদিক থেকে জীবনের ব্যর্থতা, অপ্রাপ্তির বিষণ্নতা, অপূর্ণতার হাহাকার সব মিলিয়ে গেল। এক গহিন-গভীর প্রসন্নতা তাকে ঘিরে-বেড়ে ধরল।

এই ঘোরের মধ্যেই পারভীন জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ময়ুখ চৌধুরীর নাম শুনেছ ?

ফরহাদ বলল, কোন ময়ুখ চৌধুরী ?

দুর্ভাগ্য আমার! আমি এমন একজনকে বিয়ে করেছি, যে শুধু অঙ্ক কষে, পড়ে না কিছুই। থাকো চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামের কবি-সাহিত্যিকদের খোঁজ রাখ না। কীরকম লোক তুমি, হ্যাঁ ? আবেগতাড়িত পারভীন বলে।

আহা! রেগে যাচ্ছ কেন ? বলো না—তিনি কে ? তারপর একটু থেমে বোকা চেহারা করে জিজ্ঞেস করে ফরহাদ, *কালোবরফের প্রতিবেশী*'র কবি ময়ুখ চৌধুরীর কথা বলছ তুমি ? ওই যে তোমার জানালায় আমি জেগে আছি চন্দ্রমল্লিকা'র কবি ?

কী আশ্চর্য! তুমি জানলে কী করে এইসব বইয়ের নাম ? তুমি কি কবিতা পড় নাকি ? পারভীন জিজ্ঞেস করে।

মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে মানে ?

ফরহাদ নরম কণ্ঠে বলে, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন—তোমার বুকসেল্‌ফে এই কবির প্রায় সব বই-ই আছে। তোমার শিক্ষক বলে, তাঁর বইগুলো আলাদা মর্যাদায় সাজিয়ে রেখেছ তুমি বুকসেল্‌ফে। মাঝে মাঝে আমারও তো অবসর মিলে! তাঁর এত প্রশংসা তোমার মুখ থেকে শুনি! একদিন উল্টালাম *অর্ধেক রয়েছি জলে, অর্ধেক জালে*। ভালো লাগল তাঁর কবিতা। তারপর থেকে অবসর পেলে পড়ি। এই আর কী ?

ভালোই তো ট্রাম দিচ্ছ আমাকে। পারভীনের কণ্ঠে অনুরাগ।

ফরহাদ পারভীনের কথার কোনো উত্তর দেয় না। আপনমনে বলে যায়—

ভালোবাসার কথা দিয়ে দুঃখ দিল যে মেয়েটি,
একলা করার জন্যে শুধু সঙ্গে ছিলো যে মেয়েটি,
সে জানে না—
এখন আমার সঙ্গে আছে ভালোবাসার দুঃখটুকু। একতারাতে
হৃদয় বেঁধে ঘুরে বেড়াই বাউল সেজে দিনে রাতে।

পারভীনের কী হলো কে জানে। যেন তাকে প্রতিযোগিতায় পেয়ে বসেছে। ফরহাদের আবৃত্তি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে শুরু করল—

গোলাপ গোলাপ বলে এত রাতে কে চিৎকার করে,
সে চিৎকারে আকাশের তারারা জোনাকী হয়ে ঝরে।

অনিদ্রার বুকজুড়ে গোলাপের কাঁটার আঘ্রাণ,
চোখের ভেতরে তিল—গাঁথা হয় তার মাঝখানে।
গোলাপ গোলাপ বলে কে চিৎকার করে এই রাতে,
একটি গোলাপ আহা তুলে দাও কেউ তার হাতে।

এলোমেলো হাওয়া বয়, ক্রমাগত ক্ষয় লাগে চাঁদে;

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

বুকের বেহালা জুড়ে ঘুণপোকা, নিশিথিনী কাঁদে।
কারো হাতে হাত নেই, মানুষেরা হাতহীন আজ,
অথবা বোঝে না তারা হৃৎপিণ্ড গোলাপের কাজ।

এখনো চিৎকার করে ঘুমহারা এই মধ্যরাতে,
একটি গোলাপ আহা মাটি ফুঁড়ে উঠে যাক হাতে।

এইভাবে কেটে যায় অনেকক্ষণ। তারপর—

পারভীন বলে, এভাবে আমরা কখনো গলাজলে মুখোমুখি দাঁড়াই নি, তাই না ?

ফরহাদ বলে, হ্যাঁ।

আজকে আমার খুব ভালো লাগছে। তোমার লাগছে না ?

লাগছে।

হ্যাঁ। লাগছে। এরকম টুকরো কথায় জবাব দিচ্ছ কেন ? পারভীন জিজ্ঞেস করে।

ফরহাদের মনে তখন গতরাতের ব্যর্থতার বিষণ্নতা। পারভীনের সহজ কণ্ঠ শুনে ফরহাদ বুঝে উঠতে পারছে না—আসলে পারভীন তার ওপর রেগে আছে না তাকে মাফ করে দিয়েছে। পারভীনের চোখেমুখে নিবিড় দৃষ্টি রেখে তাই ফরহাদ 'হ্যাঁ, লাগছে' এসব টুকরো কথায় জবাব দিচ্ছিল।

ভালো লাগছে, খুবই আনন্দ লাগছে। ফরহাদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠল।

ওই সময় একটু দূরের বেলাভূমি থেকে উচ্চ কণ্ঠ ভেসে এল, মুখোমুখি ভালো। দেখবেন আপা, দুলাভাই যাতে জলে ভেসে না যান।

পারভীন তাকিয়ে দেখল, গণিত বিভাগের ছালেহ আহমদ নূরী। মুখ একটু আলগা তাঁর। তবে মানুষ ভালো। জীবনকে আনন্দের রসে চুবিয়ে রাখতে ভালোবাসেন নূরী। তাঁর জীবনকে থিকথিকে কষ্ট ঘিরে রেখেছে চতুর্দিক থেকে। বউটি তাঁর বছর কয়েক আগে প্যারালাইজ্‌ড হয়ে গেছে। নিম্নাঙ্গ অচল। কোনো সন্তান আসে নি ঘরে। ওই বউকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে এই সেন্টমার্টিন পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন নূরী। নিজের কষ্টকে ভুলে থাকার জন্য এইসব রঙ্গরসে মেতে থাকেন নূরী। আজকেও বউয়ের হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে পারভীন-ফরহাদের ওপর চোখ পড়েছে তাঁর।

ফরহাদ হঠাৎ পানিতে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল। বলল, হারামজাদা। নোংরা কথা বলতে তার মুখে বাঁধল না!

নোংরা কথা দেখলে কোথায় ? একটু মশকরা করল এই আর কি। পারভীন মৃদু কণ্ঠে বলল।

ফরহাদ গলা চড়িয়ে বলল, আমি তার তালতো ভাই না বোনাই যে আমার সঙ্গে মশকরা করবে ?

পারভীন কৌতুকি কণ্ঠে বলল, উনি তো তোমাকে বোনাই ধরে নিয়েই মশকরা করলেন। শুনো নি তিনি আমাকে আপা ডাকলেন ?

ওইসব খোঁড়া যুক্তি আমার সামনে চলবে না। অসভ্যতা অসভ্যতাই। কোন লেম্যান পরিবার থেকে এসেছে কে জানে! ফরহাদের কণ্ঠে রাগ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

নূরী সাহেব কোনো অসভ্যতা করেন নি। মানুষ ভ্রমণে এলে একটু ও-রকম হয়-ই। সামান্য কথার জন্য তোমার ও-রকম চোটপাট সাজে না। কণ্ঠকে নিচে নামিয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে নূরী সাহেবের দাম্পত্য জীবনের কাহিনি বলে গেল পারভীন। শেষে জিজ্ঞেস করল, এখন বলো, ওই দুঃখী মানুষটার ওপর রাগ করা কি তোমার উচিত হয়েছে ?

ফরহাদ পারভীনের কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুপ করে জলের তলে মাথাটা নামিয়ে দিল।

বিষণ্ন মন নিয়ে সে-বেলা হোটেলরুমে ফিরে এল পারভীনরা ।

সকালের নাস্তার টেবিলে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান বললেন, পাশেই আমার শ্যালিকার হাজবেন্ডের নারকেল বাগান। মোবাইলে উনি সবার জন্য দাওয়াত পাঠিয়েছেন, ডাপের ফানি খাবার দাওয়াত। সবাই গেলে আমার ভায়রাভাই অত্যধিক খুশি হবেন। গোলাম মর্তুজার বাড়ি দাগনভূঁইয়া। অতি সতর্কতার সঙ্গে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। তারপরও উচ্চারণে ভুল করেন তিনি— ডাবকে ডাপ বলেন, প তার মুখে ফ' হয়ে যায়। ডাবের পানিকে তিনি ডাপের ফানি বলে ফেলেছেন। ডাইনিংরুমের যাঁরা মর্তুজা সাহেবের এই উচ্চারণ শুনেছেন, দমফাটা হাসিকে তাঁরা পেটে চেপে রেখেছেন, তাঁদের চোখমুখ দেখে তা অনুমান করা যাচ্ছে।

এই লোকটার প্রতি অধিকাংশ শিক্ষকের বেশ বিতৃষ্ণা আছে। প্রিন্সিপালও তাঁকে ভালো চোখে দেখেন না। একুশে ফেব্রুয়ারি, চব্বিশে মার্চ—এসব জাতীয় অনুষ্ঠানে তিনি নিজে বিভাগে বসে থেকে তাঁর অধস্তনদের পাঠান। নিজের নৈমিত্তিক ছুটির দরখাস্ত নিজে না নিয়ে গিয়ে পিয়ন দিয়ে অধ্যক্ষের কাছে পাঠান। এ নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি। তাঁর এই অপকর্মে কলেজের শিক্ষকদের সমর্থন নেই। একজন অধ্যাপক তথ্য দিলেন একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নাকি গোলাম মর্তুজার বাবা দাগনভূঁইয়ার আবদুল্লাহপুর গ্রামের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। জাফর আহমদ সেদিন প্রায় চিৎকার করে বললেন, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ছেলের কাছ থেকে কতটুকুই আর দেশপ্রেম আশা করা যায়! সরকারি চাকরি করতে করতে এইসব বেইমানরা এখনো পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে।

দাগনভূঁইয়ার গোলাম মর্তুজার দাওয়াতে তেমন কেউ সাড়া দিল না। মর্তুজা সাহেব প্রিন্সিপালকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আফা, আমি এক কাজ করি। ভ্যানগাড়ি ভর্তি করে ডাপ নিয়ে আসি। এখানে কেটে খাবে সবাই। প্রিন্সিপালের উত্তরের অপেক্ষা না করে ভায়রাভাইয়ের নারকেল বাগানের দিকে রওনা দিলেন গোলাম মর্তুজা।

ডাব আসার পর প্রায় কাড়াকাড়ি করেই খেলেন সবাই। শুধু প্রিন্সিপাল আর জাফর আহমদ ছাড়া। ডাবের পানিতে তো আর রাজাকার বা পাকিস্তানি গন্ধ নেই!

উম্মে হাবিবা বললেন, শুনেছি সেন্টমার্টিনের ডাবের পানি খুব মিষ্টি। কিন্তু এখন দেখছি মর্তুজা স্যারের ভায়রাভাইয়ের ডাবের পানি কটু, মানে কষা।

পাশে জাফর আহমদ ছিলেন। হোটেলের বারান্দায় স্তূপীকৃত ডাবের গায়ে জোরে একটা লাথি মেরে জাফর আহমদ বললেন, রাজাকারের ডাবের মধ্যে মিষ্টি পানি আশা করেন কী করে ? আর আপনিও আপা, স্বাধীনতা বিরোধীদের ডাবের পানিতে গলাই বা ভিজান কী করে ?

এইসময় ওইখানে উপস্থিত হল ফরহাদ, দূরের বারান্দায় পারভীনকেও এদিকে আসতে দেখা গেল। ফরহাদ জাফর সাহেবের শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়েছে।

ফরহাদ বলল, ডাবের পানির আবার জাত বিচার কী ? এটা স্বাধীনতা বিরোধীদের পানি, ওটা মুক্তিযোদ্ধাদের পানি—ডাবের পানির ক্ষেত্রে তো এভাবে বিচার কথা উচিত না!

জাফর আহমদ চমকে ফরহাদের দিকে তাকালেন। পারভীন যে স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ—এটা জাফর সাহেব ভালো করেই জানেন। তাঁর স্বামী হয়ে ফরহাদ যে

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বারমির মেলা

AMARBOI.COM

এরকম উল্টাপাল্টা কথা বলবেন—এ হিসাবটা জাফর সাহেব কিছুতেই মিলাতে পারছেন না।

জোর গলায় বললেন, অবশ্যই, পানিরও জাত বিচার আছে। গঙ্গাজল আর ডোবার জল এক কথা নয়। রাজাকার বদমাশদের ডাবের পানির চেয়ে এই বঙ্গোপসাগরের নোনাজল অনেক ভালো বলে আমি মনে করি।

এটা যে রাজাকারের পানি বুঝলেন কী করে? ফরহাদ জিজ্ঞেস করে।

আমার কাছে পাক্কা খবর আছে মর্তুজা সাহেবের ভায়রাভাই এখানকার শান্তি কমিটির মেম্বার ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়। এই রাজাকারের ডাবের পানি খাওয়ার চেয়ে মুক্তিযোদ্ধার মুত খাওয়া অনেক ভালো। বলে হনহন করে হাঁটা দিলেন জাফর আহমদ।

ইতোমধ্যে পারভীন ওখানে উপস্থিত হয়েছে। বিড়বিড় করতে করতে জাফর আহমদকে চলে যেতে দেখল পারভীন। বিশেষ কিছু একটা যে ঘটেছে পারভীন তা অনুমান করতে পারল। ফরহাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? জাফর সাহেব ওভাবে মুখ ভার করে চলে গেলেন কেন?

আমি কি জানি। যত্তসব বাজে লোক। ডাবের পানিতে রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা! মর্তুজা সাহেবের ভায়রাভাইয়ের পানিতে রাজাকারের নামটা কি খোদাই করা আছে নাকি? তোমাকে বলছিলাম এসব বাজে মানুষদের দলে আমাকে না আনতে। প্রায় গর্জে উঠল ফরহাদ।

ভাগ্যিস ওখানে এই সময় তেমন কেউ ছিল না। শুধু ডাবকাটার ছেলেটি ডানহাতে দাও নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে একবার পারভীন আরেকবার ফরহাদের দিকে তাকাচ্ছিল। এ অঞ্চলের ছেলে বলে শুদ্ধ বাংলাটা ভালো করে সে বুঝতে পারছিল না। বুঝলে যে কী হতো কে জানে!

পারভীন মর্মাহত কণ্ঠে বলল, এরা বাজে মানুষ! এম.এ পাস এই অধ্যাপকরা বাজে মানুষ! জাফর সাহেবের সঙ্গে তোমার কি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে পুরোপুরি আমি জানি না। মর্তুজা সাহেবের ডাবের পানি নিয়ে যে কিছু একটা হয়েছে—এটা বুঝতে পারছি। তবে তোমাকে একথাটি বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, জাফর সাহেবরা বাজে মানুষ নন। স্বাধীনতার পক্ষের লোক এঁরা, এঁদের বিরুদ্ধে কথা বলা তোমার সাজে না। বলেই ধীর পায়ে রুমের দিকে রওনা দিল পারভীন।

সেদিন দু'জনের মধ্যে আর তেমন কথাবার্তা হল না। পারভীন নিজের ভেতর এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করতে লাগল। ফরহাদ শিক্ষিত লোক, একটা অফিসের বড় সাহেব ছিল সে। বয়স হয়েছে তার। ও কী করে বলল, অধ্যাপকরা বাজে লোক! তার মুখে তো এরকম কথা সাজে না। তার বাপ যে মুসলিম লীগের ঘোর সমর্থক ছিলেন, একবার যে তার বাপ এম.এন.এ হওয়ার জন্য ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন—এ তথ্য এই অধ্যাপকরা না জানলেও পারভীন তো জানে। এই এত বছরের ঘরকন্নার জীবনে ফরহাদ কখনো পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলে নি, বরং যখন সুযোগ এসেছে মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কিন্তু আজ জাফর সাহেবের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো রাজাকার-পাকহানাদারদের প্রতি ফরহাদের একধরনের অনুকম্পা আছে। কই, এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তো কখনো এরকম সমর্থন ফরহাদের মধ্যে লক্ষ করে নি পারভীন। তাহলে কি জেনেটিক ব্যাপারটি এর জন্যে দায়ী? তার বাবার পাকিস্তান-প্রীতির বিষয়টি তার মধ্যে এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল? যতই ফরহাদ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলুক না কেন, নিজের অজান্তে সেই জেনেটিক প্রভাবটি মানে পাকিস্তান প্রীতির ব্যাপারটি আজ তার মুখ দিয়ে উদ্‌গীরিত হলো? বিষণ্ন মন নিয়ে বিছানায় বসে থাকল পারভীন।

একটু চঞ্চল পায়ে কক্ষে ঢুকল ফরহাদ। সামান্য হিংস্র ভাব তার চোখেমুখে। একে তো জাফর আহমদের ধাতানি, অপরদিকে পারভীনের প্রতিবাদ—এদুটো মিলেমিশে ফরহাদকে হিংস্র করে তুলেছে। ফরহাদ আশা করছিল, পারভীন জাফর সাহেবের কথার প্রতিবাদ করবে, স্বামীকে সমর্থন করে জাফরকে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবে। বলবে, জাফর সাহেব, মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং শান্তিকমিটি আর রাজাকারদের দ্বন্দ্ব অনেকদিন আগেই তো শেষ হয়ে গেছে। আজ এই আনন্দভ্রমণে ডাবের পানির সঙ্গে রাজাকারের তুলনা করে একটা বিতিকিচ্ছিরি গণ্ডগোল বাঁধিয়েছেন আপনি, ঠিক করেন নি, তাছাড়া ফরহাদ আমার স্বামী, আপনাদের মেহমান। তাকে অপমানটা না করলেও চলত আপনার।

কিন্তু বাস্তবে এর কিছুই করল না পারভীন। বরং বাজে লোক বলেছি বলে ওই সামান্য লোকটির সামনে আমাকে ধমকাল! বলল—ওরা স্বাধীনতার পক্ষের লোক, ওদের বিরুদ্ধে কথা বলা নাকি আমার সাজে না। কেন সাজে না? আমি ওইসব মাস্টার-ফাস্টারের চেয়ে কম শিক্ষিত? আমার কটি ডিগ্রি আছে তা জানে ওই কমবকত? বসে তো এক জায়গায় গুঁতোগুঁতি করে। আমার চেম্বার দেখেছিস ব্যাটা? এসি রুম! দুজন পিয়ন দাঁড়িয়ে থাকত আমার দরজার সামনে। আজ তুই লেকচারার না অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কে জানে, আসছস আমাকে রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা চেনাতে! মনে মনে গজর গজর করতে করতে রুমে ঢুকল ফরহাদ। দেখল, বিষণ্নমনে পারভীন বিছানার মাঝখানে যোগাসনে বসে আছে। খুব মন খারাপ হলে বা রেগে গেলে পারভীন চোখ বন্ধ করে বিছানার মাঝখানে যোগাসনে বসে থাকে। মিলাম্বিত লয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে। ধীরে ধীরে তার বিষণ্নভাব বা ক্রোধ কেটে যায়।

ভেতর থেকে কষ্ট বা ক্ষোভ কমে এলে ধীরে ধীরে চোখ খোলে পারভীন। প্রশান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। তখন তার চোখ মুখ বলে—পারভীন এখন অন্যরকম মানুষ, তার ভেতরে এখন আগের বেদনা বা রাগের লেশমাত্র নেই। প্রথম প্রথম বিষয়টি ফরহাদ বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছে পারভীনের মানসিকতার এই ব্যাপারটি। এও বুঝেছে যে পারভীন খুব দুঃখ পেলে বা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলে এই রকম চোখ বন্ধ করে যোগাসনে বসে থাকে।

আজ রুমে ঢুকে পারভীনকে এই অবস্থায় দেখে ভড়কে গেল ফরহাদ। নিমিষেই তার ক্ষোভ উবে গেল। বিছানার কোনায় আলতো করে বসে একদৃষ্টিতে পারভীনের দিকে তাকিয়ে থাকল ফরহাদ।

দীর্ঘক্ষণ পর পারভীন চোখ খুললে ফরহাদ বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে পারভীন। জাফর সাহেবকে আমার এভাবে বলা উচিত হয় নি।

পারভীন কোমল চোখে ফরহাদের দিকে তাকিয়ে থাকল, মুখে কিছু বলল না। পারভীনকে নিরুত্তর দেখে ফরহাদ সামনে এগিয়ে এসে পারভীনের হাত ধরল। অনুরোধের সুরে বলল, এরকম আর হবে না। কথা দিচ্ছি আমি।

পারভীনের বুক চিরে একটা বড় শ্বাস বেরিয়ে এল। পারভীন মৃদুকণ্ঠে বলল, ঠিক আছে। তুমি গোসলখানায় ঢোক। তুমি এলে আমি যাব গোসল করতে।

ফরহাদের বুক থেকে একটা পাথর যেন সরে গেল। পারভীন রেগে গেলে ফরহাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। দু'তিনদিন এমনকি সপ্তাহ পর্যন্ত পারভীন কথা বলে না ফরহাদের সঙ্গে। তখন পারভীন হয় ঝিম ধরে সোফায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি দেখে, নয় কানে হেয়ারফোন লাগিয়ে বেডরুমের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা সুনীল বা গুণের কবিতা আবৃত্তি শোনে। তখন ফরহাদের ছটফটানি বেড়ে যায়। কারণে অকারণে পারভীনের আশপাশে ঘুরঘুর

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রুপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

করে। পারভীনকে শুনিয়ে শুনিয়ে মনজুড়ানো কথা বলে। রেসলিং দেখার খুব শখ পারভীনের। টিভিতে রেসলিং শুরু হলে ছেলেমেয়েরা শুনতে পায় মতো করে উচ্চস্বরে ডাক দেয় ফরহাদ, পারভীন, এস এস, রেসলিং শুরু হয়েছে। আজ কিন্তু স্পেশাল রেসলিং দেখাচ্ছে। জন সিনার সঙ্গে সি এম পাঙ্কের লড়াই চলছে এখন।

ফরহাদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে একসময় পারভীনের মন নরম হয়ে আসে। একটু লজ্জাও পায়। নির্লজ্জের মতো ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে আবার ডাকছে—পারভীন এস, রেসলিং দেখবে। অন্যায় করার সময় ফরহাদের এসব কথা মনে থাকে না। তারপরও পারভীন এগিয়ে যায় ড্রয়িংরুমের দিকে। রেসলিং দেখতে বসে। একটা সময়ে তাদের কথাবার্তায় স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। মৈরম চা নিয়ে আসে। মসলামুড়ি পরিবেশনের জন্যে মৈরমকে ফরহাদ আগেই বলে রাখে। ফরহাদের দোষ এইটুকু যে অতি শিগগির সে এসব ভুলে যায়। অল্পসময়ের মধ্যে সে আবার একই রকম অপরাধ করে, যে অপরাধের জন্য পারভীনের মন খারাপ হয়, পারভীন কথা বলা বন্ধ করে, পারভীন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে। দুপুরের খাবার সময় হয়ে এল। কাপড় পাল্টে তুমি ডাইনিংরুমের দিকে যাও। আমি গোসল সেরে আসছি। বাথরুম থেকে ফরহাদ বেরিয়ে এলে পারভীন কথাগুলো বলে।

ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি এস কিন্তু। আমি বসে থাকব। বাথরুমে গমন-উদ্যত পারভীনকে লক্ষ করে ফরহাদ বলে।

কিন্তু পারভীন ডাইনিংরুমে গিয়ে ফরহাদকে বসে থাকতে দেখল না। ডানহাত ঝাঁকিয়ে চরম উত্তেজিত কণ্ঠে ফরহাদ কাকে যেন বলছে, হারামজাদা, মিথ্যেবাদী! এক মাছ খাওয়াবে বলে আরেক মাছ চালিয়ে দিচ্ছ! এসব লোককে তুমি বোকা হাঁদারাম পেয়েছ ? শেষের কথাগুলো ডাইনিংরুমে খাওয়ারত মানুষদের দেখিয়ে বলল।

কী হয়েছে, কী হয়েছে ? বলতে বলতে পারভীন দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ফরহাদের দিকে।

ফরহাদ তখনো বলে চলেছে, আমাকে মাছ চেনাচ্ছে হারামজাদা! কোনটা কোড়াল আর কোনটা মাইট্যা মাছ, আমি চিনি না ? সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিলাম চট্টগ্রামে। মাছ চেনাচ্ছে!

ফরহাদের সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে পারভীন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো।

কী হবে আবার, ওই চালবাজ ধরা পড়েছে আর কি। ফরহাদ কাউন্টারের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বলল।

পারভীন দেখল, কাউন্টারে রেস্টুরেন্ট-ম্যানেজার কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে। তার দৃষ্টি নিচের দিকে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাই বোঝাও যাচ্ছে না—ম্যানেজার লজ্জায় না রাগে মুখ নিচু করে আছে। পারভীন চোখ ঘুরিয়ে খাওয়ারত সফরসঙ্গীদের দিকে তাকাল। দেখল, কেউ মনোযোগ দিয়ে খেয়ে যাচ্ছে; দু'চারজন কৌতুকী দৃষ্টিতে একবার ফরহাদের দিকে আরেকবার ম্যানেজারের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ করে পারভীন তার বুকে কাঁপুনি অনুভব করতে লাগল। একধরনের চিনচিনে ব্যথা তার বুকের বামপাশে চাগিয়ে উঠতে লাগল। ব্যথাটাকে বুকের ভেতরে দাবিয়ে রেখে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল পারভীন।

পারভীনকে সামনে দেখে ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল আবদুল হাকিম। বয়স তার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। টেকনাফে বাড়ি। এই হোটেলে গত বছরপাঁচেক ধরে ম্যানেজারি করছে। এর আগে এরকম ঘটনার মুখোমুখি হয় নি আবদুল হাকিম। এই আবদুল হাকিমই আজ সকালে তাদের

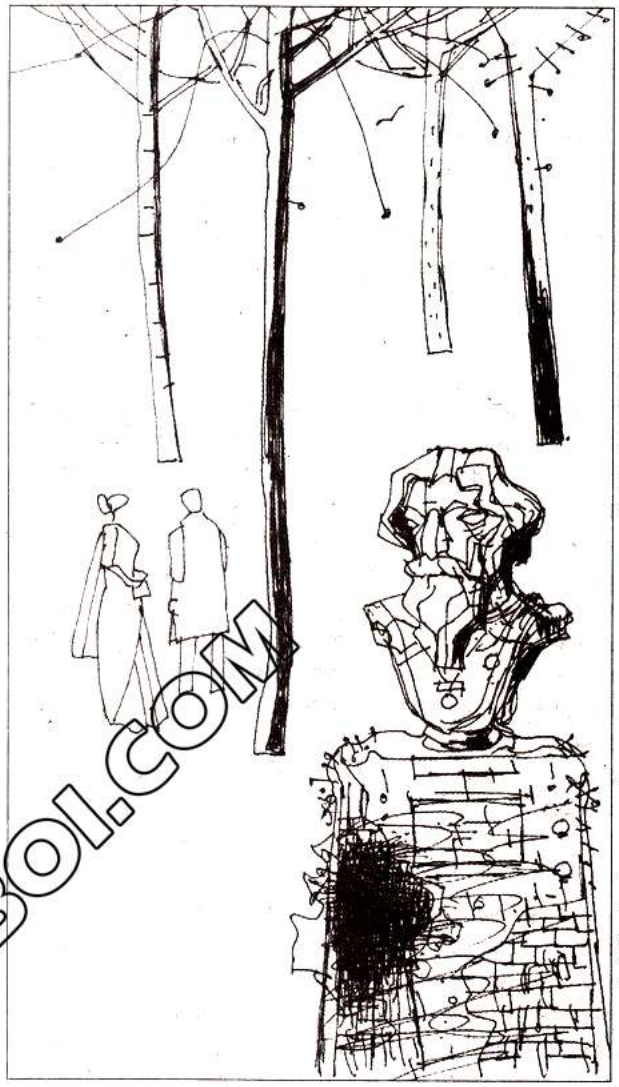

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে নাস্তার তদারকি করেছে। হাঁক দিয়ে বলেছে, অই ছুক্কইয্যা, এইকানে আফা আর সাহেবের টেবিলে আরও দুইটা গরম পরোটা দে।

ফরহাদ বলেছে, না না, আমাদের আর পরোটা লাগবে না।

কী যে বলেন দুলাবাই, আমাদের দেশে আইছেন, বাল করে না খাবাইলে আবার আমাদের বদনামি হবে। নিজস্ব উচ্চারণে কথাগুলো বলে গিয়েছিল আবদুল হাকিম।

এখন, এই মুহূর্তে হাকিমের সামনে দাঁড়াতে পারভীনের খুব লজ্জা হচ্ছিল। কোনোরকমে চোখটা তুলে পারভীন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে হাকিম ভাই ?

হাকিম মরমে মরে যাওয়া কণ্ঠে বলল, আফা, আমারই দোষ।

পারভীন বলল, কী হয়েছে বলবে তো ভাই।

এই বেলা ভাতের সাথে কোড়াল মাছ দেওয়ার কতা ছিল। কোড়াল যোগাড় কইরতে পারি নাই। মাইট্যা মাছ রানছি। ডাল আর অন্যান্য সবজি অর্ডার মতো রানছি। কোড়ালমাছ যে যোগাড় কইরতে পারি নাই আপনাদের ম্যানেজার দৌলত

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

স্যারকে বলেছি। উনি বইলছেন—ঠিক আছে, রাইতে পুষিয়ে দেবেন, মুরগি দিয়েন। আমি রাজি হইছি। তারপর একটু থেমে পারভীনের চোখে চোখ রেখে হাকিম বলল, মাঝখানে দুলাবাই এই কাণ্ডটা কইরলেন!

কী করছে ?

প্রথমে তিনি এই হাড্ডিগুলির দিকে আইসলেন। একে একে হাড্ডি পরীক্ষা কইরলেন। মাছের হাড্ডির কাছে থামি জিজ্ঞেস কইরলেন—কী মাছ ? ওই হাসিম্যা টেবিলবয় কোনো কিছু না জেনে না বুঝে বইল্ল কোড়ালমাছ। দুলাবাই এমন চেতাচেতি শুরু কইরলেন—শুয়োর কা বাচ্চা, বাটপাড়, বেইমান—এইসব। পারভীনকে লক্ষ করে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে গেল আবদুল হাকিম।

পারভীনের কানে তখন কিছুই ঢুকছিল না। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, চোখে আঁধার আঁধার ঠেকতে লাগল। পারভীন আবদুল হাকিমের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর খপ করে হাকিমের হাত চেপে ধরে বলল, মাফ করো ভাই, আমাকে মাফ করে দাও। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ফরহাদের দিকে। একটা খালি টেবিল দেখিয়ে বলল, বস।

পারভীন ডাইনিংরুমের চারদিকে তাকাল। খাওয়া শেষ করে অধিকাংশই চলে গেছে। দু'একটা টেবিলে চার-পাঁচজন খাচ্ছে। পারভীনের হঠাৎ চোখ পড়ল জাফর আহমদের ওপরে। দেখল, জাফর সাহেব একদৃষ্টিতে ফরহাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ কুঁচকানো, কপালে বলিরেখা। ঘৃণার পাতলা একটা আস্তরণ জাফর আহমদের মুখাবয়ব জুড়ে। পারভীন ধীরে ধীরে নজরটা ফিরিয়ে নিল জাফর আহমদের ওপর থেকে। জাফর সাহেব কী ভাবছে এখন ফরহাদ সম্পর্কে ? ওইদিন ফরহাদের রাজাকার প্রীতির ব্যাপারটি নিয়ে এমনিতেই চটে আছেন জাফর সাহেব। আর আজ এই কাণ্ড!

টেবিলবয় এলে শান্তস্বরে দুজনের জন্য ভাত তরকারি দিতে বলল পারভীন।

প্লেটভরা ভাত এল, আলুর ভর্তা এল, আলু-ফুলকপির ডালনা এল আর এল মাইট্যামাছ। মাইট্যামাছের বাটির পাশে সালাদের প্লেট। ক্ষিরা, গাজর, পেঁয়াজ, ধনেপাতা আর কাঁচামরিচ দিয়ে সালাদের প্লেটটি সুন্দর করে সাজানো। বাটিতে মাইট্যামাছের টুকরাটির অর্ধেকটা ঘন ঝোলযুক্ত ঝোলে ডুবে আছে। কুচি কুচি করে কাটা ধনেপাতা মাছের ঝোলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিঙে পানি আসার মতো গন্ধ চড়াচ্ছে ওই মাইট্যামাছের বাটিটি। নীরবে প্লেটে তরকারি ঢেলে নিল পারভীন। ফরহাদ তখন মাইট্যামাছের ঝোল মাখাচ্ছে ভাতে। ওইসময় দুই হাতে দুটো প্লেট নিয়ে আবদুল হাকিম টেবিলের পাশে এল। বলল, এই দুটো মামলেট আমার তরফ থেকে; আপনার জন্য আর দুলাবাইয়ের জন্য।

আরে লাগবে না, লাগবে না। এইগুলো দিয়েই আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে। ঝোলমাখানো ভাত গালে পুরতে পুরতে ফরহাদ বলে উঠল। স্বাভাবিক কণ্ঠ তার। কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির কোনো রেশ ফরহাদের কণ্ঠে পাওয়া গেল না।

আপনার কথ শুনব না দুলাবাই, খেতেই হবে। বলে নিজের কাউন্টারের দিকে রওনা দিল আবদুল হাকিম।

ফরহাদ লোভাতুর দৃষ্টিতে মামলেটের দিকে তাকাতে লাগল। আর পারভীনের চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ভাতের প্লেটে পড়তে লাগল।

তিন

আবদুল হাকিম এমন কী অপরাধ করেছিল যে তাকে হারামজাদা, মিথ্যেবাদী, শুয়োরের বাচ্চার মতো অসভ্য ইতর গালিগুলো শুনতে হল! অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে কথাগুলো বলল পারভীন। তার দৃষ্টি খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দূর-সমুদ্রে প্রসারিত।

চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলে বাম হাত অলসভাবে ছড়িয়ে সামনে বসে আছে ফরহাদ। কিছুই হয় নি এমন ভাব ফরহাদের। বিছানার মাঝখানে চোখ বন্ধ করে বসে ছিল পারভীন। এখন চোখ খুলেছে।

পারভীনের কথা কানে গেলেও কোনো জবাব দিল না ফরহাদ। বাম পায়ের ওপর ডান পা তুলে মৃদু তালে ঝাঁকাতে লাগল। ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলকে একত্র করে নাকের একটি কেশ ছিঁড়তে উদ্যত হলো। পারভীন শ্লথ হাতে পাশে রাখা চশমাটি তুলে নিল। যোগাসনে বসার সময় চশমাটি খুলে রেখেছিল পারভীন। চশমাটি পরে পূর্ণ দৃষ্টিতে ফরহাদের দিকে তাকাল। তারপর দৃঢ় কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তোমার কানে যায় নি প্রশ্নটি ? এত অসভ্যতা করলে কেন তুমি আবদুল হাকিমের সঙ্গে ? তুমি কি ভুলে গেছ যে তুমি একটি শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে বেড়াতে এসেছ ?

কী এমন অপরাধ করেছি হাকিমকে বকে ? ও মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে, আমি চ্যালেঞ্জ করেছি। এতে দোষ কোথায় ?

তোমাকে চ্যালেঞ্জ করার দায়িত্ব কে দিয়েছে ?

কেউ দেয় নি। আমার মন বলেছে প্রতিবাদ করতে, করেছি। তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ?

মহাভারতের তুমি বোঝ কি ? এ্যাঁ, কী বোঝ তুমি মহাভারতের ? পড়াশোনা তো ওই সেগ্স আর বিয়োগ নিয়ে। না পড়েছ সাহিত্য, না জেনেছ সমাজকে। বাবার জীবন কাচঘেরা ঘরে বসে কাটিয়ে দিয়েছ। ক্লার্ক পিয়নদের নিয়ে কাজ কারবার। ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা তো খুব বেশি করো নি! তুমি কি বুঝবে ভদ্রতা কাকে বলে! রাগে ফেটে পড়ল পারভীন।

মিথ্যেকে মিথ্যে বলেছি; বাটপারের মুখোশ খুলে দিয়েছি। এতে আমার অপরাধ কী হলো বুঝতে পারছি না। ফরহাদ বলল।

শোন, তুমি এ সফরে মেহমান। মেহমান মেহমানের মতো থাকবে। যদি কিছু বলতেই হয়, বলবে কলেজ কর্তৃপক্ষ যাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে। তুমি কে বলার ? তা-ও এরকম ইতর ভাষায়! পারভীন বলল।

ফরহাদ বলল, তুমি আমাকে ইতর বললে ? তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ পারভীন।

মাত্রাজ্ঞান নেই তোমার। কোথায় কী কথা বলবে সে জ্ঞান এই বৃদ্ধবয়সেও তোমার জন্মায় নি। ছিঃ ছিঃ! তোমার জন্য আজ আমাকে এতগুলো কলিগের সামনে ছোট হতে হল! তারপর কণ্ঠে শ্লেষ ঢেলে পারভীন বলল, হেঃ, মানুষ পায় নি আর, মাত্রাজ্ঞান শেখাতে গেছে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে! সেই বাটপার মিথ্যেবাদী আবদুল হাকিমের মামলেট খেতে তো বাধ না তোমার! লজ্জিত হয়ে ওই মিথ্যেবাদীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত না তোমার!

পারভীনের উগ্রমূর্তি দেখে চুপসে গেল ফরহাদ। আস্তে করে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল ফরহাদ। দেখল, পারভীন আগের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে বিছানার মাঝখানে বসে আছে। দেয়ালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পারভীন। ক্ষোভে দুঃখে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটো। সাধারণত চশমা পরে যারা, তাদের রাগ ক্ষোভ চশমার আড়ালে ঢাকা পড়ে। অনুরাগের ব্যাপারটিও চশমার ফ্রেমে আটকে যায় অনেকটা।

কিন্তু এই মুহূর্তে চশমা ভেদ করে পারভীনের ক্ষুব্ধ দু'চোখের জ্বালা বেরিয়ে আসছে। ফরহাদ বুঝল, পারভীনের ভেতরটা শান্ত হয় নি এখনো। এমনিতে

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা
বাংলার রঙ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

পারভীন শান্ত স্বভাবের। রেগে গেলেও ক্ষোভকে অন্য নারীর মতো নগ্নভাবে প্রকাশ করে না। নিজে নিজে পুড়তে থাকে। নির্বাক হয়ে যায় সে, হিমশীতল আচরণ করে সে তখন।

কিন্তু আজ কেন জানি, কোনোক্রমেই শান্ত হচ্ছে না পারভীনের ভেতরটা। কী রকম যেন একটা জ্বালা অনুভব করতে থাকে পারভীন। এ জ্বালা ঘৃণার না অপমানের বুঝতে পারছে না সে। সকালে ডাব নিয়ে যে কাণ্ডটা করল ফরহাদ, তা ভুলতে না ভুলতেই রেস্টুরেন্টের কীর্তিকাণ্ড। সকালে না হয় একজন সহকর্মীর সামনে বেফাঁস মন্তব্য করেছে ফরহাদ, তার এই কু-মন্তব্যের ব্যাপারটি না হয় একজনে জেনেছে; কিন্তু দুপুরের মাছ সংক্রান্ত কীর্তিটি! এটা কি এড়িয়ে যাবার ব্যাপার ? ডাইনিংরুম ভর্তি কলিগ, তাঁদের সন্তানাদি, তাঁদের স্বামী অথবা স্ত্রী। তাঁদের সবাই হয় ঘৃণার চোখে অথবা করুণার চোখে তাদের দিকে তাকিয়েছে। পারভীন ভালো করেই জানে—তাঁদের ঘৃণা ফরহাদের জন্য আর করুণা তার জন্য। তাঁরা ভাবলেন—কী অসহায় এই ভদ্রমহিলা! বাংলাবিভাগের প্রধান তিনি, নামকরা শিক্ষক। অসাধারণ রুচিশীল এই মহিলাটি কী সাধারণ মানের একজন মানুষের ঘর করছে!

তুমি যে রকম ভাব ধরে আছ, তাতে মনে হচ্ছে অনেক বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছি আমি। ফরহাদ শেষ পর্যন্ত পারভীনকে উদ্দেশ করে বলল।

পারভীনের শান্ত হয়ে আসতে থাকা মনটি ধপ করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চড়া গলায় বলল, তুমি শুধু অন্যায় করো নি, জঘন্য অপরাধ করেছ। এবং এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তারপর একটু থেমে হতাশ গলায় বলল, আসলে আমারই ভুল হয়ে গেছে। তোমার মতো অসামাজিক মানুষকে নিয়ে আমার এঁদের সঙ্গে এখানে আসা উচিত হয় নি।

আমি কি তোমার পায়ে ধরে সাধাসাধি করেছিলাম—আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও, কোনোদিন আমি সেন্টমার্টিন দেখি নি, সেন্টমার্টিন না দেখলে আমার জীবন বিফলে যাবে! ব্যঙ্গের স্বরে কথাগুলো বলল ফরহাদ।

পারভীন কণ্ঠকে খাদে নামিয়ে বলল, তাই করা উচিত ছিল আমার, তোমাকে রেখেই আসা উচিত ছিল আমার। এনে ভুল করেছি।

একা এলে তো ভালোই হতো, অন্তত তোমার জন্যে ভালো হতো। ফুর্তিতে এদিক ওদিক ঘুরতে পারতে। রাত-বিরাতে এর ওর সঙ্গ নিতে পারতে।

চুপ যাও ফরহাদ! এত নিচে নেমে গেছে তোমার মন ? একজন শিক্ষিত লোকের মুখ দিয়ে স্ত্রী সম্পর্কে একী কথা! তোমার ভেতরের হীন চিন্তাটা এতদিন লেবাস দিয়ে ঢেকে রেখেছিলে তা হলে ? নিজের দিকে তাকাও, কতটুকু তোমার সক্ষমতা ? রাতের পর রাত অক্ষমতার প্রমাণ রাখছ তুমি। নিজের ব্যর্থতার গ্লানি তোমার মধ্যে সন্দেহের কাঁটা হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমি ধিক্কার দিই তোমার এই নষ্ট চিন্তাকে। বলে বিছানা থেকে নামল পারভীন। ওড়নাটা গায়ে জড়াল। ডানহাতে ভ্যানেটিব্যাগটা তুলে নিয়ে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল পারভীন। পেছনে অসহায়ভাবে বসে থাকল ফরহাদ।

একটা প্রবালখণ্ডের ওপর বসে আছে পারভীন। তার পা দুটো সামনের প্রবালখণ্ডে ছড়ানো। ধবধবে সাদা সুন্দর পা পারভীনের। দু'পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল ভেতরদিকে একটু চাপা। কালচে প্র .লের ওপর ছড়ানো পা দুটোকে অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে। একটু দূরের প্রবালখণ্ডের ওপর মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়ছে। জলকণা পারভীনের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। দু'একটি ফোঁটা পারভীনের মুখমণ্ডলে এসে পড়ছে। পড়ন্ত সূর্যের আভায় ফর্সামুখের ওই জলবিন্দুগুলোকে মুক্তা বলে ভ্রম হচ্ছে। কপালে ছড়ানো কুন্তল বাতাসের তাড়নায় এলোমেলো উড়ছে। ওড়নার একটি মাথা বুক থেকে খসে বালিতে পড়ে আছে। ভেজা বালি আর জলে ওড়নার সে অংশ মাখামাখি। এসব দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই পারভীনের। নিষ্পলক চোখে বঙ্গোপসাগরের অথৈ নীল জলের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুই ভাবছে না এখন পারভীন। কিন্তু সে ভাবছে। ভাবছে তার ফেলে আসা জীবন সম্পর্কে। কেন জানি তার মায়ের মুখটি এই মুহূর্তে বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। সবেমাত্র অনার্সে ভর্তি হওয়া পারভীনের যখন বিয়ের প্রস্তাব এল, বেঁকে বসেছিল পারভীন। মা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, ভালো ছেলে মা, ভালো বেতনের চাকরি। দেখতে সুন্দর। রাজি হয়ে যা মা। তোর বাপও মারা গেছে। তোর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি দায়িত্বমুক্ত হই।

আমার পড়াশোনা ? পারভীন জিজ্ঞেস করেছে।

মা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিল, পড়ার সকল দায়িত্ব ওরা নেবে বলে কথা দিয়েছে।

সবাই ওরকম কথা দেয় মা।

এরা এরকম হবে না মা। বনেদি বংশ। টাকার অভাব নেই। অভাবী মানুষরাই কথা রাখে না, রাখতে পারে না। এরা কথা রাখবে। তোমাকে পড়াশোনা করার সুযোগ দেবে।

পারভীন মায়ের কথায় নিমরাজি হয়েছিল সেদিন। অল্পদিনের মধ্যে ফরহাদের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল পারভীনের। তখনো পারভীন নিখিলেশকে দেখে নি। দু'চারজন বান্ধবীর কাছে নিখেলেশের কথা শুনেছে শুধু।

নিখিলেশের কথা মনে পড়ায় পারভীনের ভেতরটা আনচান করে উঠল। অদৃশ্য অথচ অনুভবগ্রাহ্য একটা মৃদু কম্পন পারভীনের সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে সে কম্পন কমে এলে একটা প্রশান্ত ভালো লাগা পারভীনের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ পারভীনের সামনে দিয়ে কা কা করতে করতে একটা দাঁড়কাক উড়ে গেল। মন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পারভীনের। বড় বিচিত্র পাখি এই দাঁড়কাক। পাতিকাকগুলো গোটা দেশে দেখা যায়। গ্রামের চেয়ে শহরে বেশি। ময়লা আবর্জনা শহরেই পর্যাপ্ত। ওগুলোই ওদের খাবার। দাঁড়কাক কাকদের মধ্যে উঁচু জাতের। রাজবংশ বলা যায়। রাজার সংখ্যার মতো দাঁড়কাকের সংখ্যাও কম। আগে গ্রামগঞ্জে বেশ দেখা যেত দাঁড়কাকদের। কী জানি কেন, আজ ওরা বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। বহুদিন পর পারভীন দাঁড়কাক দেখল। ছোটবেলায় যেখানে থাকত তারা, জঙ্গুলে ছিল জায়গাটা। ওখানে দাঁড়কাকের সঙ্গে নিত্য দেখা হতো পারভীনের। দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠ শুনে সেই ছোটবেলায় বড় ভয় পেত পারভীন। দাঁড়কাক ডেকে উঠলেই দৌড়ে গিয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকাত। হঠাৎ বেশ উচ্চস্বরে হেসে উঠল পারভীন। আজ তার সামনে দিয়ে ভয় জাগানিয়া কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে দাঁড়কাক উড়ে গেল। কিন্তু মায়ের আঁচল কোথায় যে পারভীন মুখ লুকাবে ?

মা, আজকেও তোমার আঁচল খুঁজছি মা। কাকের কর্কশ কণ্ঠের ভয়ে নয়, তোমার সেই দেখতে সুন্দর ভালো ছেলেটির লজ্জায়। আজ কাককে ভয় করি না মা, আমার যত ভয় এবং লজ্জা তোমার নির্বাচিত সেই জামাইটির জন্যে। দাঁড়কাকের মতো কর্কশ কণ্ঠে ফরহাদ আজ বললে—ওকে ছাড়া আসলে আমি নাকি রাত-বিরাতে মানুষের সঙ্গসুখ নিতাম। কী লজ্জার কথা মা—ভেবে দেখ। আমার বিবাহিত জীবনের কোনো কথা কখনো তোমাকে খুলে বলি নি মা। কোনো কোনো সময় কী নিদারুণ কষ্টে যে আমার দিন গেছে মা! তুমি কষ্ট পাবে বলে সেই

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা
বাংলার রঙ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

বেদনার কথাগুলো কখনো তোমাকে বলি নি। এমনিতে তোমার অপার দুঃখ। দাদারা বিয়ে করে এখানে ওখানে ঠাঁই নিয়েছে। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। একা থাকো মা তুমি। বাবার স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে সময় পার করছ। তোমাকে আমি কী করে কষ্ট দিই বলো! তাই তোমার কাছে আমার জীবনের বেদনার দিকটি আড়াল করে রেখেছি, শুধু আনন্দের ভাগ দিয়েছি তোমাকে। ওই আনন্দ সবসময় খাঁটি ছিল না। একদিনের কথা বলি মা তোমাকে—

হেমলতার জন্ম হয়ে গেছে তখন। আমি চট্টগ্রাম শহরের বড় একটা কলেজে পড়াই। দীর্ঘ পাঁচ বছর সিলেট শহরে চাকরি করে সবেমাত্র চট্টগ্রাম শহরে বদলি হয়ে এসেছে ফরহাদ। প্রমোশনও পেয়েছে। অফিস থেকে তাকে গাড়ি দেওয়া হয়েছে। তার কক্ষটিও নাকি এয়ার কন্ডিশনড। গাড়ি, সাজানো অফিস এবং ভালো বেতনের কল্যাণে ফরহাদের মধ্যে বেশ ভাব এসে গেছে। গাড়ির হর্ন শোনার পরও গেইট খুলতে একটু দেরি করায় দারোয়ানকে বেশ তুই তোকারি করতে শুনলাম এক বিকেলে। হেমলতাকে ঘুম পাড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি, ফরহাদের আগমন অপেক্ষায় কিনা জানি না, তবে তখন তার অফিস থেকে ফেরার সময় হয়েছিল। কলেজে যাই নি সেদিন। মাঘী পূর্ণিমা কি আশুরার বন্ধ ছিল সেদিন। প্রাইভেট ফার্ম বলে ফরহাদরা এখন তখন ছুটি পেত না। গোটা দিন ঘরের মধ্যে ঘরকন্নায় ব্যস্ত থেকে থেকে হয়তো আমার মন সেসময় একটু খোলা হাওয়ার পড়ন্ত বিকেল দেখতে চেয়েছিল অথবা ফরহাদ ফিরছে—এটা দূর থেকে দেখে ভালো লাগবে—এর যে-কোনো একটি কারণে অথবা দুটো কারণেই আমি বিকেলের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। রুটিনবাঁধা জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার বা হেমলতাকে সমস্ত দিন কাছে পাওয়ার আনন্দে মনটা আমার সেসময় ভীষণ ভালো ছিল। ফরহাদের গাড়ির হর্ন শুনে কেন জানি মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল সেই বিকেলে। তৃপ্তিময় চোখ নিয়ে গেইটের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলাম আমি। দেখলাম কফিল গেইট খুলল। তারপর দেখলাম গাড়ি থেকে ফরহাদ হঠাৎ নেমে পড়ল এবং কফিলের দিকে তেড়ে গেল। আমি বিস্মিত চোখে দেখলাম, ফরহাদ বামহাত দিয়ে গেইট কীপার কফিলের কলার চেপে ধরেছে। আমার কানে ফরহাদের কণ্ঠ ভেসে এল—স্টুপিড, সান অব এ বিচ, গেইট খুলতে এত দেরি হলো কেন তোর? এতবার হর্ন দেওয়ার পরও ...। এরপর ফরহাদ কী বলেছে তা আমার কান দিয়ে ঢোকে নি। আমি লজ্জায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম তখন। কান ভোঁ ভোঁ করছিল, মাথার পেছনে তীব্র একটা ব্যথা ছলকে করে জানান দিয়ে মিলিয়ে গেল। যখন চোখ খুললাম, দেখলাম গাড়িটি আমাদের বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বিল্ডিংটি চার তলার। প্রতিটি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট—মুখোমুখি। আমরা থাকি দোতলার পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাটে। ফরহাদ যে কোম্পানিতে চাকরি করে, সেই কোম্পানিরই বিল্ডিং এটি। অফিসারদের থাকার সুবন্দোবস্ত করেছে কোম্পানিটি। ফরহাদ এই বিল্ডিংয়ের সবচাইতে বড় অফিসার। অর্থাৎ এখানে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের বস।

অন্য ফ্ল্যাটের গিন্নিদের দুএকজন চাকরি করেন। আমার মতো কলেজে না। কেউ ব্যাংকে, কেউবা প্রাইভেট ফার্মে। সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করি বলে আমার একটা আলাদা মর্যাদা আছে এখানে। আমি আমার মর্যাদা বিষয়ে সচেতন। এরকম একটা পরিবার থেকে গেইট কীপারকে অপমান!

কী করব মা আমি? এই সময়ে আমার কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো! তুমি আমাকে কী পরামর্শ দেবে জানি না, আমি কিন্তু ডোর বেল বাজার পর স্বাভাবিক পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

দরজা খোলার পর আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল হয়তো ফরহাদ। নইলে কেন বলল, কী হয়েছে তোমার? তোমাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন? যেন কিছুই হয় নি এরকম শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠ ফরহাদের।

স্তম্ভিত চোখে আমি শুধু ফরহাদের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েছিলাম। আমার অস্বাভাবিক চেহারা দেখে ফরহাদ কী ভেবেছিল জানি না। বেডরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার শরীর কি ভাল নেই?

আমি ফরহাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিই নি। উত্তর দেওয়ার জন্যে ভেতর থেকে কোনো তাগাদাই অনুভব করি নি আমি। ভেতরটা আমার তখন জ্বলছিল, লজ্জার তীব্র একটা জ্বালা আমার ভেতরটা পুড়িয়ে দিচ্ছিল তখন। যে লোক কিছুক্ষণ আগে একটা ক্রাইম করে এল, তার কী স্বাভাবিক কণ্ঠ! যে লোকটা আসতে যেতে সালাম দেয় তার গায়ে হাত, তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি!

আমার ভদ্রতাবোধ আমার গলা চেপে ধরেছে তখন, বলছে—পারভীন তুমি তো অধ্যাপক, বাংলা পড়াও। তোমার সামনে তোমার স্বামীর এরকম মানবেতর আচরণ! কী অসহনীয়, তা-ই? যদি তা-ই হয় তাহলে প্রতিবাদ করছ না কেন? কেন চিৎকার করে বলছ না—ফরহাদ, ওই সাধারণ দরিদ্র মানুষটির গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করল না? প্রতিবাদ আমি করতে পারতাম মা, তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে আমি ফরহাদের ওপর চড়াও হতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করি নি। করি নি এই ভেবে যে, সমস্ত দিনের ক্লান্তি নিয়ে এই শেষবিকেলে ফরহাদ বাড়ি ফিরেছে; এই সময় আমার প্রতিবাদ সংসারে একটা ভজকট সৃষ্টি করবে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, একটু পরে নিচে নেমে আমি কফিলের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসব। তুমি হয়তো ভাবছ মা এ আমার বাড়াবাড়ি। ফরহাদের সামান্য এই কর্মকাণ্ডের জন্যে মাফ চাওয়ার কী আছে? মুখে একসময় বললেই হলো। না মা, মুখে বললে হতো না। আর এ আমার নতুন করে মাফ চাওয়া নয়। তোমার সুন্দর, ভালো বেতনের চাকুরে জামাইয়ের জন্য এর আগেও আমাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। তা অবশ্য গেইট কীপার কফিলের কাছে নয়, আমারই কলিগ লুৎফর হাসানের কাছে।

সেই কাহিনিটিও শুনো মা তুমি।

আমার এক সহকর্মীর ভাইয়ের বিয়েতে গেছি। রাতে ছিল অনুষ্ঠানটি। ফরহাদও নিমন্ত্রিত হয়েছিল সেই বিয়েতে। আমাদের কলেজটি এমন যে, সহকর্মী বা তাঁর আত্মীয়ের বিয়েশাদিতে কলেজের সবাইকে দাওয়াত করা হয়। এই দাওয়াতে থাকে আন্তরিকতা। ফলে কারও দাওয়াত কেউ এড়িয়ে যান না। হান্নানা বেগম আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—আপা, দুলাভাইকে অবশ্যই সঙ্গে আনবেন। আমার একমাত্র ভাই। খুব খুশি হব আমরা।

অন্যসময় গাঁইগুঁই করলেও কেন জানি এই দাওয়াতে যেতে ফরহাদ রাজি হয়ে গেল। আমার খুব ভালো লাগল। ফরহাদকে নিয়েই আমি ওই সহকর্মীর ভাইয়ের বিয়েতে গিয়েছিলাম মা। তুমি জান কিনা জানি না মা, চট্টগ্রামে মুসলমানি বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়েদের বসার এবং খাবার ব্যবস্থা আলাদা। পুরুষরা বসে এক জায়গায়, মেয়েরা অন্য রুমে। কমিউনিটি সেন্টারের দরজা থেকেই নারী-পুরুষ আলাদা হয়ে যায়। পুরুষরা কৃচিৎ মেয়েদের রুমে যায়, প্রয়োজন শেষে ত্বরিত ফিরে আসে। সাহসী নারীদের কেউ কেউ পুরুষকক্ষে পরিচিতদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। আমি আড্ডা দিয়ে সবেমাত্র মেয়েদের রুমে গেছি।

মিনিট দশেকও যায় নি। হঠাৎ মোবাইল পেলাম, কে যেন ও-পাড় থেকে বলছে—আপা, একটু নিচে নামুন, গণ্ডগোল বেঁধেছে। আমি তড়িঘড়ি করে নিচে নেমে

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রঙ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

মোবাইল করলাম। ফরহাদ জানাল—সে বাসায় চলে গেছে। তখন তুমি আমার মনের অবস্থাটা বোঝ মা!

উঠ, চল রুমে চল। চমকে পেছনে ফিরে তাকাল পারভীন। দেখল, পিঠের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ফরহাদ, কাঁচুমাচু মুখ। পারভীন কোনো কথা বলল না। সমুদ্রের দিকে মাথা ঘুরাল। দেখল, জল অনেক দূর নেমে গেছে। নানা আকারের প্রবাল সামনের বেলাভূমি জুড়ে। আঁধারের কাছে দিনের আলো অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করেছে। গোটা বেলাভূমি শুনশান। পারভীন এত আত্মমগ্ন ছিল যে কখন আঁধার নেমেছে, কখন জল নেমে গেছে বহুদূরে, কখন জনশূন্য হয়ে গেছে গোটা বেলাভূমি—টের পায় নি। ফরহাদ না ডাকলে হয়তো আরও দীর্ঘ দীর্ঘ সময় এভাবে কেটে যেত।

উঠে দাঁড়াল পারভীন। মাথা নিচু করে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল। ব্লু মেরিন তখন উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে।

চার

সে সন্ধেয় রুমে ফিরে ফরহাদ ঝাপটে ধরেছিল পারভীনকে। পারভীন বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল, ওই সময় পেছন থেকে ঝপ করে জড়িয়ে ধরেছিল ফরহাদ। নিস্পৃহ চোখে ঘাড়টা ফিরিয়েছিল পারভীন। সমস্ত মুখ জুড়ে নির্লিপ্ততা। এসব কিছুর দিকে নজর নেই ফরহাদের, সে শুধু পারভীনের খোলা পিঠে ঠোঁট ডুবিয়ে আদর করে যেতে লাগল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল পারভীন। কী যেন ভাবল গভীরভাবে। তারপর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ফরহাদের বাহুবন্ধন আর ঠোঁট থেকে। ধীর পায়ে বাথরুমে ঢুকে গেল সে। রাগ-অভিমানের চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ফরহাদ।

আগোছালো পোশাক আর আলুথালু শরীর নিয়ে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়াল পারভীন। খোলা পিঠে, যেখানে কিছুক্ষণ আগে ফরহাদের ঠোঁট সক্রিয় ছিল, ডানহাত বাড়িয়ে দিল পারভীন। সেখানে ফরহাদের লালা এখনো লেগে আছে। লালা মাখানো পিঠে আস্তে আস্তে আঙুল বুলাল পারভীন। গতরাতে এরকমই তো চেয়েছিল সে। চেয়েছিল—ফরহাদ তার শরীরে ঝড় তুলুক, দুকূল ভাসিয়ে দিক প্লাবনে। কিন্তু ফরহাদ ব্যর্থ হয়েছিল, তাকে চরম প্রাপ্তির সুখ দিতে সে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু আজ তো জেগেছে ফরহাদ, উন্মাতাল আবেশে সে জড়িয়ে ধরেছে পারভীনকে; শরীরের উষ্ণতা দিয়ে পারভীনকে ভরিয়ে তুলতে চাইছে! কিন্তু এইসময়, পারভীন তার ভেতরে কোনো উষ্ণতা অনুভব করছে না। গতরাতের উত্তাল ঢেউয়ের লেশমাত্র নেই এখন পারভীনের দেহে আর মনে। আছে—ক্ষোভ, ফরহাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ।

পারভীন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে নিজের দিকে তাকাল। দেখল—তার ঠোঁট থির থির করে কাঁপছে, মুখে ক্লান্তির ছাপ, কপাল বিরক্তিতে কুঁচকানো। আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকলে নাকি রাগ কমে আসে, ভেতরের অস্থিরতা কেটে যায়। এই আশায় বেশ কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকল পারভীন। কিন্তু কই তেমন করে তো কাটছে না তার ভেতরকার অশান্তি! পূর্বের রাগ বা ক্ষোভ বা বিরক্তি এখনো তার মনকে ঘিরে রেখেছে। পূর্বের আনন্দময় স্মৃতিকে সে স্মরণে আনতে চাইল।

বিয়ের পর প্রথমরাতের কথা হঠাৎ মনে পড়ল পারভীনের। ও-রাত ছিল বাসররাত। ভাবি-নানি-দাদিরা প্রচলিত ঠাট্টা মসকরা করে শেষে যাঁর যাঁর ঘরে চলে গেছেন। আলতো ঘোমটা টেনে বিছানার মাঝখানে বসেছিল পারভীন। চারদিকে ফুলের পাপড়ি আর ফুল ছড়ানো, ঝুলানো। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ফরহাদ বিছানায় বসেছিল, বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই বসে পড়েছিল ফরহাদ। বুকটা পারভীনের দুরু দুরু করছিল। অনার্স প্রথম বর্ষের মেয়ে। বিয়ে, বিয়ের ফলশ্রুতি—এসব বিষয়ে তেমন করে জানে না পারভীন। ভাবি আর ফাজিল বান্ধবী সুতপার কাছ থেকেই অল্প স্বল্প যা কিছু জানা। এসএসসি পাস করেই সুতপার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার অভিজ্ঞতার ঝুলি তখন ভর-ভরন্ত। সে-ই বিয়ের আগে আগে কানের কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে অনেক কথা বলেছিল। তারপর প্রকাশ্যে বলেছিল, দেখবি কী রকম ভয় পেয়ে যায়।

পারভীনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।

বাংলা বিভাগের সেমিনার কক্ষের এককোনায় বসেছিল ওরা। সুতপার কথা শুনে বান্ধবীরা হল্লা করেছিল—কী রে সুতপা, কিসের ভয়ের কথা বলছিস? পারভীনকে কী পরামর্শ দিচ্ছিস তুই?

সুতপা মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, পারভীনের মতো আগে তোদের বিয়ে ঠিক হোক। তখন আসিস আমার কাছে, সব শিখিয়ে দেব। বলে চোখ টিপেছিল সুতপা।

বান্ধবীরা সুতপাকে ভালো করে চেনে। যত অ-কথা কু-কথায় পেট ভরা তার। রগরগে কথা বলতে বাধে না তার। তারা বুঝে গেছে, নিশ্চয়ই পারভীনকে কোনো কুপরামর্শ দিয়েছে সুতপা, নইলে কানে কানে কথা কেন?

আহা! বল না ভাই, কী পরামর্শ দিলি তুই পারভীনকে! বান্ধবীরা সমস্বরে আবার জিজ্ঞেস করল।

তিনদিন পরেই তো পারভীনের বিয়ে। বিয়ের পরে পারভীন ফিরে এলে পারভীনকেই জিজ্ঞেস করিস—কী পরামর্শ দিয়েছিলাম তাকে। তারপর পারভীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কীরে পারভীন, বাসররাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবি না তখন এইসব অনভিজ্ঞ ছুকড়িদের?

হঠাৎ বিবমিষা জেগেছিল পারভীনের। সুতপার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বেসিনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল পারভীন।

আজ ভাবতে খুব মজা পাচ্ছে পারভীন—কী দুষ্টটাই না ছিল সুতপা! কী কী বাজে কথাই না বলেছিল সেদিন সুতপা, কানে কানে। তার সবটুকু করলে ফরহাদ সেদিন হার্টফেল করত নিশ্চয়ই। তবে সুতপার পরামর্শে কিছুই যে করে নি পারভীন, তা নয়।

সে রাতে, মানে বাসররাতে, বিছানার মাঝখানে ঘোমটা টেনে বসেছিল পারভীন। ধীরে ধীরে কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ঘোমটা একটু তুলে ধরতেই 'হালুম' বলে বিকট একটা চিৎকার দিয়েছিল পারভীন। তাতেই চিৎপটাং। ধপাস করে বিছানা থেকে ফ্লোরে পড়ে গিয়েছিল ফরহাদ। চোখ তার ছানাবড়া। মুখে গোঁ গোঁ আওয়াজ। ফরহাদের বুকের ধড়ফড়ানি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল পারভীন। বোকা বোকা চোখ দিয়ে ফরহাদ তাকিয়েছিল পারভীনের দিকে। পারভীন খিল খিল করে হেসে উঠেছিল, মুখে বলেছিল, কী দুষ্টু বুদ্ধি না দিয়েছে আমাকে! তারপর বিছানা থেকে নেমে এসে ফরহাদের ডানহাত ধরেছিল পারভীন।

বলেছিল, কী হাঁদারাম তুমি! মেয়েমানুষের একটা হালুম শব্দ শুনেই চিৎপটাং! এত ভীরু তুমি!

ফরহাদ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলেছিল, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিলে তুমি আমাকে! সারাটা জীবন এই হালুম শব্দটা আমার মনে গেঁথে থাকবে।

আজ সন্ধেয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিক করে হেসে উঠল পারভীন। তারপর আয়নার সামনে থেকে সরে সাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। দীর্ঘক্ষণ ধরে সাওয়ারের পানিতে নিজের সমস্ত শরীর ভিজাল। দেহটা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত, মনটা শীতল না হওয়া পর্যন্ত পারভীন খোলা সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা

AMARBOI.COM

বাথরুম থেকে পারভীন বের হয়ে দেখল, ফরহাদ জামা-প্যান্ট পরে বেশ ফিটফাট হয়ে মাথায় চিরুনি বুলাচ্ছে। এক পলক ফরহাদের দিকে তাকাল পারভীন। ফরহাদ গুনগুন করছে—'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।' বিস্মিত হলো পারভীন—ফরহাদের মুখে গান! তাও আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত! পাকসার জমিন সাদ বাদ দিয়ে যার সুর সাধনা শুরু হয়েছিল স্কুলে, যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যু সালটা জানে কিনা সন্দেহ, সে গাইছে রবীন্দ্রসঙ্গীত! এই সময় হঠাৎ একদিনের কথা মনে পড়ে গেল পারভীনের। ওই দিনের ঘটনা মনে পড়ায় মনটা নরম হয়ে এল তার।

সেদিন সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। চা-টেবিলে বসে এলোমেলোভাবে টেবিল ঠুকতে ঠুকতে ফরহাদ গুনগুনিয়ে উঠেছিল—'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়, দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়।' পারভীন সবেমাত্র চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। ফরহাদের বেসুরো কণ্ঠ শুনে ভিড়মি খেল পারভীন। ফকাৎ করে চা বেরিয়ে এল পারভীনের মুখ থেকে। টেবিলের এধারে ওধারে পারভীনের মুখের চা ছড়িয়ে পড়ল।

বোকা চাহনি নিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফরহাদ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, কী হয়েছে তোমার ? এমন করছ কেন ?

কিছু হয় নি। তোমার দরাজ গলা শুনে আমার ভীষণ হাসি পেল। হাসির ঠেলায় গরম চা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

কেন, আমার কণ্ঠ কি খারাপ ? ফরহাদ হাঁপ ছেড়ে বলল।

না না, খারাপ হতে যাবে কেন! তোমার জীবনবাদী গম্ভীর উন্নত কণ্ঠ কার না ভালো লাগবে! ভাগ্যিস, এই মুহূর্তে ছেলেমেয়েরা এখানে ছিল না। থাকলে যে কী হতো! কৌতুকী কণ্ঠ পারভীনের।

ফরহাদ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, শেখাচ্ছ তো মেয়েকে লইন্দ সঙ্গীত। কত করে বললাম, লতাকে আধুনিক গান শেখাও। না, আধুনিক গান না, লইন্দ সঙ্গীত শেখাবে মেয়েকে!

পারভীন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, লইন্দ সঙ্গীত কি ?

কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর ফুটিয়ে ফরহাদ বলেছিল, অই, তোমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত আর কী ?

পারভীন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, কী! রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তুমি লইন্দ সঙ্গীত বললে! যে মানুষটির গান বাঙালিকে আনন্দ-বেদনার সাগরে ভাসায়, গোটা জাতি স্তব্ধ হয়ে যাঁর গান শোনে, তাঁর নাম বিকৃত করতে তুমি একটুও দ্বিধান্বিত হলে না।

ফরহাদ বুঝতে পারে নি পারভীন এত সিরিয়াস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ফান করার জন্য রবীন্দ্রকে লইন্দ বলেছে সে। কিন্তু সেই মুহূর্তে এ্যাপোলজি চাইতেও ইচ্ছে করছিল না ফরহাদের। একধরনের ঔদ্ধত্যভাব হঠাৎ তার মধ্যে জেগে উঠল। সে বলে উঠল, কোনো অসুবিধা হচ্ছে তোমার—রবীন্দ্রকে লইন্দ বলাতে ? রবীন্দ্রনাথকে লইন্দনাথ বলি বা কবীন্দ্রনাথ বলি, তাতে তো রবীন্দ্রনাথের কিছু যায় আসে না! তিনি মরে গেছেন সে-ই কবে। এখন তো তিনি ক্রোধ—অনুরাগের উর্ধ্বে। তুমি ক্ষুব্ধ হবার কারণ তো খুঁজে পাচ্ছি না!

শোন, তোমাদের মতো দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ বাঙালির রক্তে মিশে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গান, তাঁর কবিতা বাঙালিকে এখনো দিশে দেখায়। পারভীন ক্ষোভের সঙ্গে বলল।

দিশে দেখায় না, মাঝে মাঝে বেদিশেও করে।

কী বলতে চাইছ তুমি ?

বলতে চাইছি—মাঝে মাঝে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ভুল কথা দিয়ে গান তৈরি করেছেন। আর তোমরা ভাবে বিগলিত হয়ে সেই গান শোন বা গাও। আর ওই কী যেন বললে, আনন্দ-বেদনার সাগরে ভাসো।

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা

কী ভুল কথায় লিখেছেন ? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পারভীন।

ওই যে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে ?

আমতা আমতা করে পারভীন জিজ্ঞেস করল, এই লাইনে কি ভুল দেখলে তুমি ?

বন্দি কাউকে মানুষ তো তালা ভেঙে উদ্ধার করে, চাবি ভেঙে তো নয়! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা-ই লিখেছেন, শুধুমাত্র যাবি'র সঙ্গে মিল রাখার জন্যে তালা না লিখে চাবি লিখেছেন। চোখে মুখে স্মিত হাসি ছড়িয়ে কথাগুলো বলল ফরহাদ।

পারভীন বোকা বনে গেল। গানটা শতবার শুনেছে সে, কিন্তু ফরহাদের মতো করে তো ভাবে নি! কী আশ্চর্য! ফরহাদ এতগুলো ভাবার সময় পেল কখন ?

ফরহাদ পারভীনের মনের কথা যেন বুঝতে পারল। বলল, তুমি ভাবছ—এই কাঠখোট্টা মানুষটি আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ভাবল কখন! শোন, রবীন্দ্রনাথকে আমার কিন্তু তেমন ভালো লাগে না। কেন জান, তিনি স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করেন নি বলে।

পারভীন সচকিত দৃষ্টিতে ফরহাদের দিকে তাকাল। বলল, মানে!

রবীন্দ্রনাথ যে বালিকাটিকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন তার নাম ভবতারিণী দেবী, ঠিক কিনা ? ফরহাদ জিজ্ঞেস করল।

তাতো ঠিক আছে। পারভীন বলল।

ফরহাদ এবার উষ্ণ কণ্ঠে বলল, না, ঠিক নেই। বিয়ে করেই তিনি ভবতারিণীর মা-বাবার দেওয়া নামটি পাল্টে দিলেন। নাম দিলেন—মৃণালিনী। ভবতারিণী এবং তার মা-বাবার ওপর রবীন্দ্রনাথ সুবিচার করেছেন বলে কি তোমার মনে হয় ?

পারভীন দ্বিধাযুক্ত কণ্ঠে বলল, এখানে অপরাধের কী দেখলে তুমি ?

অপরাধের কথা বলছি না, বলছি ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কথা। ভবতারিণীর জীবন থেকে মা-বাবার স্মৃতি মুছে ফেলতেই রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভেবে দেখ, ভবতারিণীর ওই সময়ের মনের অবস্থা! ধরো, তুমি যখন আমার ঘরে এলে, তখন যদি আমি তোমার নাম পাল্টে সজনে ডাঁটা বলে ডাকা শুরু করতাম তোমাকে, তুমি সুখ পেতে ?

পারভীন নামের সঙ্গে সজনে ডাঁটার সম্পর্ক কী ?

মৃণালিনী শব্দটা এসেছে তো মৃণাল থেকে। মৃণাল মানে তো পদ্মের ডাঁটা। আমি তো আর রবীন্দ্রনাথের মতো বিখ্যাত নই, রবীন্দ্রনাথের জন্যে যদি পদ্মের ডাঁটা হয়, তো আমার জন্য সজনে ডাঁটা বরাদ্দ হওয়া উচিত। কী বলো তুমি ? বলে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে থাকল ফরহাদ।

পারভীন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, তুমি এগুলো কখন জানলে ? জানলে কীভাবে ?

ফরহাদ আগের মতো হাসি হাসি মুখে বলেছিল, সে এক কঠোর সাধনার কথা রে ভাই। যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হলো — জানলাম তুমি বাংলায় অনার্স পড়। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের জীবন দেবতা, সুখ দুঃখের সাথী। ভাবলাম—তোমার সঙ্গে ঘর করতে গেলে তো আমারও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু জেনে রাখা উচিত। বলে থামল ফরহাদ।

তারপর ?

তারপর আর কি, চাকরি শেষে পাবলিক লাইব্রেরিতে দৌড়—ঝাঁপ শুরু করি। গভীর মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়ি। ফরহাদ বলল।

পারভীন বলল, তুমি যা-ই বলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীর ওপর অবিচার করেছেন, আমি মানতে নারাজ।

ফরহাদ যেন নিজেকেই বলছে, স্ত্রীকে তিনি 'ছোট বউ' বলে সম্বোধন করতেন।

AMARBOI.COM

তাহলে 'বড় বউ' কে ? বড় বউ কি তাহলে কাদম্বরী ? সারাটা জীবন দুঃখেই কেটেছে ভবতারিণীর। বারো বছর পুরাবার আগেই ভবতারিণী অন্তঃস্বত্ত্বা হলেন। উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে পাঁচ পাঁচটি সন্তান জন্ম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মা সারদাদেবী যেমন আঁতুড়ঘর থেকে বেরোতে পারেন নি, ভবতারিণীর ক্ষেত্রেও অনেকটা তা-ই হয়েছিল।

ধুর, রাখতো এসব কথা। পারভীন মৃদু ধমকের সুরে বলল।

ফরহাদ এবার পারভীনের মুখের দিকে তাকাল। করুণকণ্ঠে বলল, এসব শুনে তোমার তো খারাপ লাগার কথা না পারভীন। রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীকে তেমন করে সময় দেন নি। এজন্য তাঁদের দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি হতো। দাম্পত্যজীবন নিয়ে ভবতারিণী খুব সুখী ছিলেন বলে আমার মনে হয় নি কোনোদিন।

পারভীন বলে উঠল, সুখ তো আপেক্ষিক। আর একতরফাভাবেও তো দাম্পত্যজীবনে সুখ আসে না। দুজনের দায়িত্ববোধ সমান থাকলেই কেবল প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে।

ফরহাদ বলল, তুমি বলতে চাইছ—রবীন্দ্র-দাম্পত্য জীবনে যদি অসন্তুষ্টির কিছু থাকেও বা, তার জন্যে একা রবীন্দ্রনাথ দায়ী নন, এই তো ? রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীকে কখনো মনে জায়গা দিয়েছিলেন বলে আমার মনে হয় নি। গৃহকোণের শয্যাতেই ভবতারিণীকে পেয়ে উৎফুল্ল হতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মনের নিভৃত অন্দরে স্থান ছিল অন্য এক তরুণীর, ইন্দিরা দেবীর। যে স্ত্রী স্বামীর বাস্তবজগতে এবং মানসজগতে স্থান পায়—সে দাম্পত্যজীবন সুখের না হয়ে পারে না পারভীন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা হয় নি কখনো। কাদম্বরী, ইন্দিরা এবং পরে আরও অনেকে রবীন্দ্রমনে বড় ধরনের জায়গা করে নিয়েছে বারবার, রবীন্দ্রমানসে ভবতারিণীর জায়গা খুব বেশি সংকীর্ণ, ভবতারিণী সেখানে খুব বেশি সংকুচিত। আসলে রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনে এমন একজন নারী কাম্য ছিল, দেহ—সৌন্দর্যে যিনি আনা তড়খড় বা লুসি স্কট এবং মানস প্রবণতায় কাদম্বরী দেবী বা ইন্দিরা দেবী।

পারভীন বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিল, আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না তোমার এরকম ভাবনা শুনে। তুমি তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ নিয়ে পড়ে থাক। এগুলো ভাববার তুমি সময় পেলে কখন ?

ফরহাদ মুখে কিছু বলল না। বেশ একটা তৃপ্তির আভা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ আগে রবীন্দ্রকে লইন্দ বলায় ফরহাদের বিরুদ্ধে পারভীনের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তা কখন মন থেকে অপসৃত হয়ে গেছে পারভীন টের পায় নি। ফরহাদের কথা শুনতে শুনতে কখন তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে পারভীন—তাও খেয়ালে রাখে নি সে। ফরহাদের জন্য সে নিজের মধ্যে একটা নিবিড় মুগ্ধতা অনুভব করতে লাগল।

মুগ্ধ দৃষ্টি ফরহাদের মুখের ওপর ফেলে পারভীন জিজ্ঞেস করল, কাদম্বরীর ব্যাপারটি কমবেশি সকলেরই জানা। এখানে তুমি ইন্দিরার প্রসঙ্গ তুললে কেন ? উনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক ব্যাপারটি বুঝলাম না।

ফরহাদ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, সেখানেই তো সকল রহস্য লুকিয়ে আছে।

রহস্য! রহস্য আবার কী ? পারভীন জিজ্ঞেস করে।

ফরহাদকে যেন আজকে কথায় পেয়ে বসেছে। বিয়ে করার পর পারভীনের সঙ্গে এভাবে কথা বলার সুযোগ হয়ে উঠে নি তার। দাম্পত্যজীবন যাপনের কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ হন নি কখনো। আজকে যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা উঠলই, তাহলে রবীন্দ্র-বিষয়ে তার ভাবনা উজাড় করে দিলে ক্ষতি কি ?

ফরহাদ বলল, ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫—এই নয় বছরে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে দুইশ বায়ান্নটি চিঠি লিখেছিলেন, ছিন্নপত্রাবলি তার সাক্ষ্য। আর এই সময়ে স্ত্রীকে লেখা প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা পনেরো। ইন্দিরা দেবীকে লেখা কোনো কোনো চিঠি পড়লে তোমার মাথা চক্কর দেবে। মনে হবে—নিবিড় আশ্লেষে মগ্ন একজন প্রেমিকের চিঠি একজন প্রেমিকাকে। চিঠির কোনো কোনো অংশ তো মুদ্রণ—অযোগ্য। ছিন্নপত্রাবলির আট নম্বর চিঠিটা পড়লে তুমি বুঝবে গোটা ব্যাপারটি। প্রবৃত্তির দাহ এবং তার চরিতার্থতার সমর্থনে এমন এমন কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যা বইতেও ছাপা হয় নি, এমনকি কাঁচি দিয়ে কেটে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বর্জন করা হয়েছে।

পারভীনের মুখ থেকে কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। ছাত্রীজীবনে এবং অধ্যাপনা জীবনে রবীন্দ্রনাথ পড়েছে পারভীন। কিন্তু এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করে নি। আর ফরহাদ-বিষয়ে তার যে ধারণা ছিল, তাও পাল্টে যেতে লাগল রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে ফরহাদের আজকের কথায়। রবীন্দ্রনাথকে তো শুধু ভক্তিবাদী দৃষ্টিতে বিচার করলে চলবে না! তিনিও তো রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, কাম-ক্রোধ-লোভ-লালসা তাঁর মধ্যেও তো ছিল! আজ ফরহাদ রক্ত-পুঁজ আর লালসার রবীন্দ্রনাথকে খুলে মেলে ধরছে পারভীনের সামনে। শুনলে মন্দ কি ?

আগ্রহভরে পারভীনকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফরহাদ দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, গোটা জীবনে স্ত্রীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যা ছত্রিশটি। এই চিঠিগুলো পরম যত্নে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন ভবতারিণী দেবী। প্রায় কুড়ি বছরের দাম্পত্যজীবনে ভবতারিণীও তো কম চিঠি লেখেন নি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জান ?

কী! চিঠির সংখ্যার মধ্যে আবার দুঃখের কী বিষয়টি লুকিয়ে আছে ? পারভীন মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

দুঃখের বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীর একটা চিঠিও সংরক্ষণ করে রাখেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীর চিঠিকে কোনোই গুরুত্ব দেন নি। যখন ট্রেন ভ্রমণ করেছেন তার টিকেটটি পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শুধু রাখেন নি তাঁর পাঁচ সন্তানের জননী ভরতারিণীর চিঠিগুলো। বাবাকে লেখা বালিকাকন্যা বেলার চিঠিপত্রও রক্ষিত হয়েছে, রক্ষিত হয় নি শুধু দুই দশকের দাম্পত্যজীবনে স্বামীকে লেখা স্ত্রীর পত্রাবলি। কী আশ্চর্যের তাই না!

হ্যাঁ, আশ্চর্যের তো বটেই! বিস্মিত চোখ পারভীনের।

ভবতারিণীও কম যান না, প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ওপর। স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত ভবতারিণীরও তো সঙ্গ চাই। জমিদারি, লেখাপড়া আর সৃজনকর্মে নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সময় দেন নি তেমন। রবীন্দ্রনাথের চারপাশে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের অনেক লোক গিজগিজ করছে। কিন্তু এত বড় বাড়িতে ভবতারিণী প্রায় নিঃসঙ্গ। খুব স্বাভাবিকভাবে সমবয়সী বিদ্যানুরাগী বলেন্দ্রনাথের প্রতি ভবতারিণীর প্রীতি-ভালোবাসা গভীরতর হয়েছে। এ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি।

মানে ? পারভীন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

ফরহাদ পারভীনের প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর দিল না। বলতে থাকল, অকালে মারা গেলেন বলেন্দ্রনাথ। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন ভবতারিণী দেবী। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন মাসের মাথায় মারা গেলেন ভবতারিণী। ওই যে বলছিলাম প্রতিশোধ, ভবতারিণী প্রতিশোধই নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওপর, মৃত্যুর আগে আগে।

কী রকম ?

তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গড়ায় মগ্ন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়ালেন ভবতারিণী। আর্থিক অনটন চলছিল তখন রবীন্দ্রনাথের। নিজের গায়ের গহনা বেচে দিলেন তিনি। হয়তো

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

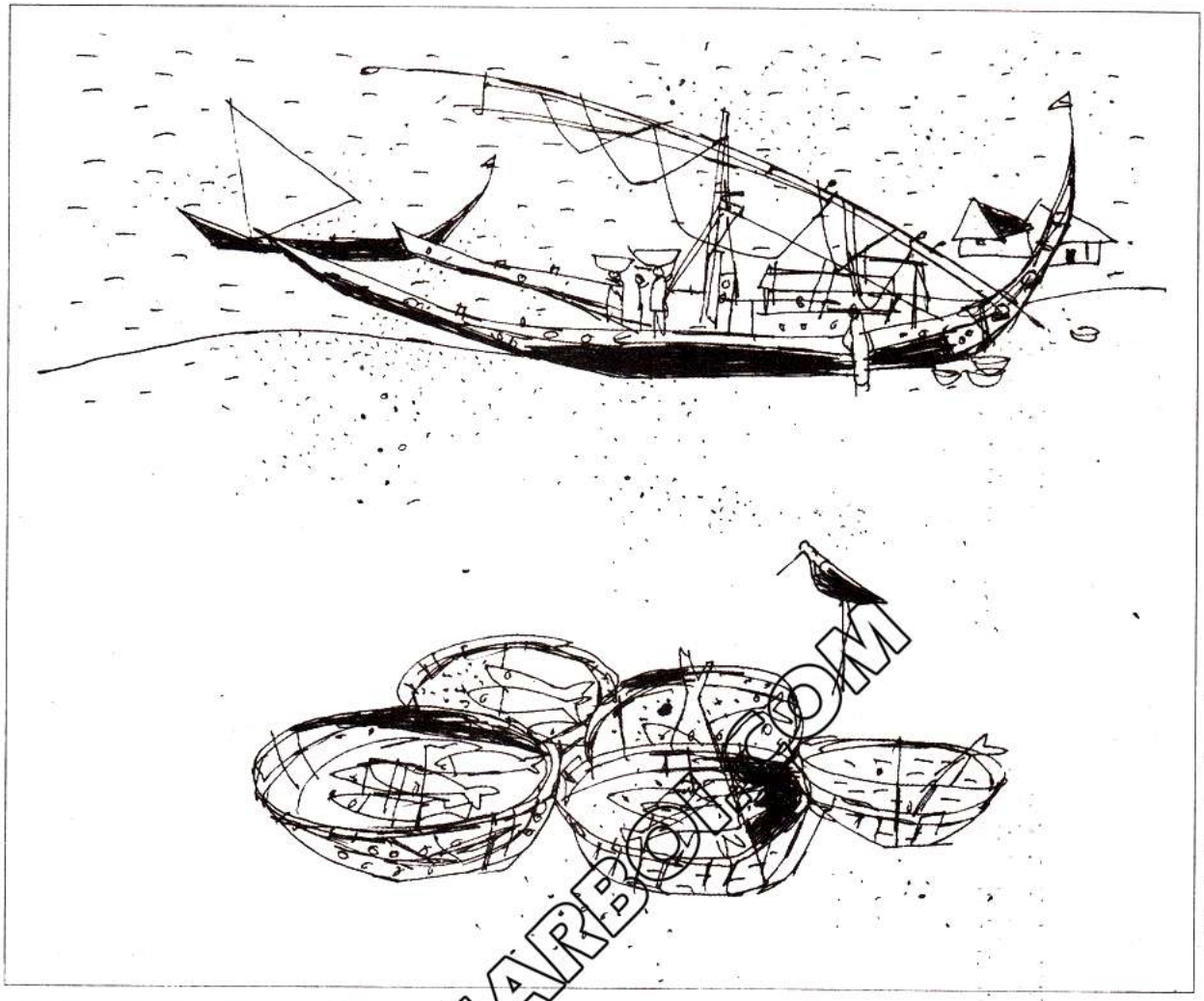

AMARBOI.COM

ভেবেছেন—সারাজীবন যে লোকটি তাঁকে স্ত্রীর যথাযথ মর্যাদা দেন নি, তাঁর দেওয়া গহনা নিজের কাছে রাখার দরকার কি? আশ্রমসেবাতেই ভবতারিণী নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করলেন। ভাঙা মন আর অবিরাম শ্রমে তাঁর শরীর দ্রুত ভাঙতে লাগল। মারা গেলেন ভবতারিণী, বয়স তখন তাঁর উনত্রিশ বছর পুরায় নি। বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল ফরহাদ। লম্বা একটা শ্বাস টেনে বলেছিল, বড় তৃষ্ণা লেগেছে, এক গ্লাস পানি দেবে!

একনিঃশ্বাসে পানি খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখে ফরহাদ। আজ যেন কথায় পেয়ে বসেছে তাকে। অনেকক্ষণ কথা বলার ক্লান্তি ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। পারভীন ফরহাদের ক্লান্তি টের পায়। নিবিড় চোখে বলে, তুমি আর কথা বলো না। গোসলের সময় হয়ে গেছে। তুমি গোসলে যাও, আমি একটু রান্নাঘরের দিকে যাই দেখি।

ফরহাদ ধীরে ধীরে বলে, এখন যেও না, শেষটা শুনে যাও অন্তত।

শেষটা আবার কি? পারভীনের উৎসুক চোখ।

ফরহাদ বলে, অসুস্থ ভবতারিণীকে চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। পুত্রকন্যাদের শান্তিনিকেতনেই রেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথকে কিছু সময়ের জন্যে কলকাতায় এনেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ। ছোটছেলে শমীকে বড় ভালোবাসতেন ভবতারিণী। মৃত্যুর আগে শমীকে দু'চোখে একবার দেখার জন্যে কী আকুলিবিকুলি মায়ের! কিন্তু তাঁর মর্মভেদী তীব্র ব্যাকুলতার কোনো মূল্য দেন নি রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যুর মাত্র ক'ঘণ্টা আগে বড়ছেলে রথীকে দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন ভবতারিণী দেবী। তখন তিনি বাক্‌রুদ্ধ। ছেলেকে দেখে দু'চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল শুধু। ও হ্যাঁ, তুমি তো জান, রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীকে 'ভাই ছুটি' বলে সম্বোধন করতেন। ছেলেকে দেখে অন্তিম মুহূর্তে ভবতারিণী হয়তো বলতে চেয়েছিলেন—আমার ছুটি হয়েছে বাবা, আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। একটু থামল ফরহাদ। স্ত্রীর মুখের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পারভীন কিছু বলছে না দেখে ফরহাদ আবার বলতে শুরু করল, মৃত্যুর রাতেই শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভবতারিণীর শবকে। মুখাগ্নি করার জন্য রথীন্দ্রনাথকে শ্মশানে যাওয়ার অনুমতি দেন নি রবীন্দ্রনাথ, নিজেও যান নি। স্বামী অথবা পুত্রের দায় মুখাগ্নি করার। রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীর মৃতদেহের ওপরও অবিচার করেছেন। মুখাগ্নি করেন নি, আত্মজকেও করতে দেন নি।

আশ্চর্য! এই কী রবীন্দ্রনাথ! স্তম্ভিত পারভীন বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল।

হ্যাঁ, এই-ই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মা সারদাদেবী যখন মারা যান, তখন

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ। পুত্র রথীন্দ্রনাথের মতো তিনিও চৌদ্দ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। পুত্রবধূর মতো শাশুড়িও রাতে মারা যান এবং রাতেই সারদাদেবীর দেহ শ্মশানে পাঠানো হয়। মায়ের শব বহনকারীদের সঙ্গে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্মশানে গিয়েছিলেন। পুত্রকে কেন মাতৃকার্য সম্পাদনে বাধা দিলেন রবীন্দ্রনাথ, তা আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

ফরহাদের কথা শেষ হয়ে গেছে। গোটা ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা। দু'জনের কেউ আর কথা বলছে না। পারভীন তাকিয়ে আছে বুকসেল্‌ফে রক্ষিত রবীন্দ্ররচনাবলির দিকে। দু'চোখে সে তীব্র জ্বালা অনুভব করছে। আর ফরহাদ তাকিয়ে আছে পারভীনের দিকে।

এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল সেদিন। একসময় ফরহাদ বলে উঠেছিল, আমি তো তেমন খারাপ স্বামী নই, অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো। কী বলো পারভীন! কোনো কথা বলে নি পারভীন সে সময়, শুধু ব্যগ্রতা নিয়ে ফরহাদের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল।

পূর্বের স্মৃতি রোমন্থনে পারভীনের মন নরম হয়ে এল। মন চাইল—সব কিছুকে, সবাইকে ক্ষমা করে দিতে। ফরহাদের বিরুদ্ধে বিগত সময়ের সকল অপরাধ পারভীনের মন থেকে ধুয়ে মুছে যেতে লাগল। গভীর একটা তৃপ্তিবোধ পারভীনকে উদ্বেলিত করে তুলল হঠাৎ করে। অন্তরের গহিন ভেতরে গুনগুনিয়ে উঠল—মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা।

মন বলল—পারভীন, তুমি বেড়াতে এসেছ এই সুদূর সমুদ্রপাড়ে। এখানে মানুষ আসে সমুদ্রের কাছে নিজের দুঃখকে জমা রাখার জন্য। সমুদ্রজল সর্বগ্রাহী। মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট-বেদনা আর্তনাদকে অবলীলায় গ্রহণ করে সে। দুঃখের পরিবর্তে সে মানুষকে প্রফুল্লতা ফিরিয়ে দেয়। দেখ নি—মানুষ দলে দলে, যুগলে যুগলে সমুদ্রজলে ঝাঁপায়। কারণ কি ভেবেছ কখনো তুমি? ডুবসাঁতার দিতে দিতে মানুষ জলের কাছে তার দেহের আর মনের সকল হাহাকার গচ্ছিত রাখতে শুরু করে। গোসল শেষ করে মানুষকে সমুদ্রজল থেকে উঠে আসতেও তো দেখেছ। তুমি কী দেখেছ? বলবে—ডুবসাঁতারে সকল শক্তি হারানো ক্লান্ত নরনারীদের উঠে আসতে দেখেছ তুমি। তুমি তাদের শ্লথ পদক্ষেপ, তাদের অবসন্ন দেহভঙ্গি লক্ষ করে একথা বলছ। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি—তাদের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছ তুমি? জানি তুমি আমতা আমতা করে বলবে—তেমন করে তো তাকাই নি কখনো স্নানক্লান্ত মানুষগুলোর মুখের দিকে! অভিনিবেশি চোখে তাদের চেহারার দিকে তাকালে দেখতে পেতে সেখানে নিবিড় এক প্রশান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। জাগতিক সকল বেদনাকে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়ে এক গভীর অলৌকিক উৎফুল্লতা নিয়ে আস্তানায় ফিরছে তারা। পারভীন, তুমিও বেড়াতে এসেছ এই সমুদ্রকন্যা সেন্টমার্টিনে। গতকালকেই তো ফরহাদকে নিয়ে তুমি ডুবসাঁতার দিয়েছ এই সমুদ্রজলে। তুমি কি জমা রাখ নি তোমার সকল মনোকষ্ট? যদি সমুদ্রজলে না বিসর্জন দাও তোমার সকল মর্মভেদী বেদনাকে, তাহলে আগামীকাল আবার জলে নামো, ফরহাদকে সঙ্গে নিয়েই নামো কিন্তু। ফরহাদকেও বলো—তার অন্তরে লুকানো যত কালিমা আছে, তার সবগুলো জলকে অর্পণ করতে। দেখবে তোমার মতো, ফরহাদের ভাবনাও নীলজলের স্বচ্ছতা পেয়েছে।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন পারভীন আনমনা হয়ে গিয়েছিল টের পায় নি। ফরহাদের কণ্ঠে সংবিত ফিরল তার। ফরহাদ বলছে, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, শুঁটকির দোকানে যেতে হবে। আজ শাড়ি পরবে কিন্তু, লাল শাড়িটা। কপালে লাল টিপ দিও। যেন আজ দুপুরে কিছুই হয় নি, এমনি ভাব ফরহাদের।

পারভীন ম্লান হেসে বলল, তুমি বারান্দায় গিয়ে বস, আমি চেঞ্জ করে নিই।

এত এত বছর কেটে গেল, তোমার লজ্জাটা গেল না! দুষ্টুমিতে ঝিলিক দেওয়া চোখে ফরহাদ বলল।

পারভীন কৃত্রিম রাগের সুরে বলল, তুমি যাবে বারান্দায়, না আমি সৈকতের দিকে রওনা দেব আবার!

ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা। যাচ্ছি যাচ্ছি। বলতে বলতে বারান্দায় গেল ফরহাদ।

পাঁচ

ইট-সিমেন্টে বাঁধানো ঘাট, দোতলা সমান। টেকনাফ ছেড়ে আসা জাহাজগুলো এই ঘাটেই ভিড়ে। দীর্ঘ ঘাট। ঘাট পেরিয়ে রাস্তা, পাকা রাস্তা। এই রাস্তাটি যেতে যেতে সেন্টমার্টিনের একেবারে পশ্চিমপ্রান্ত ছুঁয়েছে। ঘাট-লাগোয়া রাস্তার দু'পাশ জুড়ে দোকান, বেশির ভাগ শুঁটকির। লাম্বু, কোড়াল, ছুরি, রূপচাঁদা, নানা আকারের চিংড়ি, অলুয়া, রিশ্‌শা, নোনা ইলিশ, পোপা, মাইট্যা, লইট্যা— এসবের শুঁটকি বিক্রি হয় দোকানগুলোতে। একসময় এসব দোকানের প্রধান আকর্ষণ ছিল লাক্ষা শুঁটকি। বাঙালিরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইদানীং মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড—এসব দেশেও লাক্ষার ডিমান্ড বেড়েছে। এমনিতে বঙ্গোপসাগরে লাক্ষা কমে এসেছে, যা কিছু ধরা পড়ে বিদেশে চালান হয়ে যায়। তারপরও যে দু'চারটি শুকানো হয়, চড়া দাম। শুঁটকির দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলো। আলোতে শুঁটকিগুলো চিকচিক করছে। শুঁটকির গন্ধ বাতাসে ভাসছে। অভ্যস্তদের কাছে এ গন্ধ লোভনীয়, অনভ্যস্তদের কাছে বিদ্‌ঘুটে।

দোকানে দোকানে হালকা ভিড়। কেউ দরাদরিতে ব্যস্ত, কেউ শুঁটকি বাছবাছিতে। কারও কারও হাতে শুঁটকির থলে। কম ভিড়ের একটা দোকানে ঢুকল ফরহাদ, সঙ্গে পারভীন। লালশাড়ি আর লালটিপে অসাধারণ দেখাচ্ছে পারভীনকে।

দোকানদার আবদুস ছবুর। বছর চল্লিশেক বয়েস। বাহারি লুঙ্গি পরনে, গায়ে টাইট গেঞ্জি। গেঞ্জি ফেঁড়ে পেটটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখে সুরমা। কড়া সেন্টের ভুরভুরে গন্ধ বেরুচ্ছে আবদুস ছবুরের গা থেকে। লালসা জড়ানো চোখে পারভীনের দিকে একবার তাকাল ছবুর। তারপর মাথা নিচু করে বড় একটা ঢোঁক গিলল। মনে হলো—মুখে যে লালা জমেছে, তা পেটে চালান করে দিল ছবুর।

ফরহাদ জিজ্ঞেস করল, লাক্ষা শুঁটকি আছে?

ফরহাদের প্রশ্ন ছবুরের কানে গেল না। আগ্রহভরে পারভীনকে জিজ্ঞেস করল, আফনি কী চাচ্ছেন যে আফা?

পারভীনের উত্তরের অপেক্ষা না করে ছবুর বলে যেতে লাগল, সব ধরনের ফু—নি আছে আফা। যেমন ধরেন ছুরি, রূপচান্দা, লইট্যা, ফাঁইস্যা, মাইট্যা—সব আছে আমার দোকানে। আফনার কী মাছ লাগবে বলেন।

এই সময় ফরহাদ বলল, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি লাক্ষা শুঁটকি আছে কিনা? আপনি কোনো উত্তর না দিয়ে শুঁটকির নামতা পড়ে যাচ্ছেন।

আবদুস ছবুর ধমকের সুরে বলল, দেইখছেন না একজনের লগে কথা বইলছি। অই চোদমারানির পোয়া রমজাইন্যা, ইক্কে আছোনা। সাআবে কি চাআর চা—ছোনা খানকির পোয়া। শেষের কথাগুলো নির্বিকারভাবে দোকানের হেলপারের উদ্দেশ্যে বলে রিরংসা ভরা চোখে পারভীনের দিকে তাকাল ছবুর।

পারভীন আবদুস ছবুরের চোখের ভাষা বুঝল। তার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ফরহাদকে লক্ষ করে বলল, চল চল, অন্য দোকানে যাই। বলে ছবুরের দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল পারভীন। ফরহাদও বেরোল পিছুপিছু। পেছনে

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

আবদুস ছবুরের কণ্ঠ শোনা গেল, সূর্য উডের রে ভাই লাল মারি, রইস্যা বন্ধু ছাড়ি যার গই মোরে বুগত্ ছেল মারি।

রাস্তার ওপারের দোকানের দিকে যেতে যেতে পারভীন বলল, কী দরকার আমাদের লাক্ষা শুঁটকির ? আর কেনই বা ওই দোকানে গেলে ? তোমার কথায় লাল শাড়ি পরে বুকে সেল মারার গান শুনতে হল আমাকে!

থতমত খাওয়া ভঙ্গিতে ফরহাদ বলল, আমি কি জানতাম ওই শুয়োরের বাচ্চা খাটাশ স্বভাবের!

আহা! তুমি এসব কী বলছ ?

ঠিকই বলছি। তুমি কি মনে করেছ আমি ওই হারামির চোখের ভাষা বুঝি নি ?

থাক, ওসব থাক। শুঁটকি না কিনলে হয় না! পারভীন প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

না, হয় না। যে করেই হোক আজ আমাকে লাক্ষা শুঁটকি কিনতে হবে।

কেন ?

তার জবাব আমি তোমাকে পরে দেব। চলো এখন ওপাশের দোকানে যাই।

পারভীন মৃদু শ্বাস ফেলে বলল, চলো।

দোকানে ঢুকতেই দোকানি দাঁড়িয়ে গেল। বলল, আস্‌সালামুআলাইকুম।

উভয়ে চমকে দোকানির দিকে তাকাল।

দোকানি তরুণ, বয়স আটাশ ত্রিশ। বলল, কী শুঁটকি নেবেন স্যার ?

পারভীন চুপ থাকতে পারল না। বলল, তোমার আচরণ দেখে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি।

দোকানি বলল, আমাদের দোকানের মূলধন দুইটা। একটা ভালো আচরণ, অন্যটা শুঁটকি।

ফরহাদ মৃদুকণ্ঠে বলল, না, অন্য দোকানে এরকম ব্যবহার পাই নি তো!

তরুণটি এবার বলল, নিশ্চয় আপনারা ছবুরের দোকান থেকে আসতেছেন। ও একটা হারামি। গত পরশু একজন মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য মাইর খাইছে। যাক স্যার, কী মাছ নেবেন ?

ফরহাদ বলল, লাক্ষা শুঁটকি।

ইয়াছিন মাথা চুলকে বলল, লাক্ষা শুঁটকি? লাক্ষা শুঁটকি তো এখন তেমন পাওয়া যায় না স্যার। মাঝে মইধ্যে কোনো কোনো দোকানে ওঠে।

কী বলো তুমি ? অই, তোমার সামনের দোকানে দেখ, লাক্ষা শুঁটকি না ওগুলো ? ফরহাদ বলল।

ইয়াছিন নিচু স্বরে বলল, মাথা লাক্ষা, বডি কোড়াল।

মানে! চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করল ফরহাদ।

স্যার, কোড়াল শুকালে লড়িগুলা লাক্ষার মতো দেখায়। চালাক দোকানিরা লাক্ষার মাথাটা সুপার গ্লু দিয়ে কোড়ালের লড়ির সঙ্গে লাগাইয়া দেয়। আপনারা যারা বাইর থেকে কিনতে আসেন, বুঝতে পারেন না, আমরা বুঝি। একটু থেমে ইয়াছিন আবার বলল, অই শুঁটকি লাক্ষা না, কোড়াল।

পারভীন বলল, তাহলে লাক্ষা শুঁটকি পাব না ?

পাবেন আপা, আমার কাছে একটা আছে। দাম বেশি। শো—তে দিই নাই।

ফরহাদ বলল, তোমার ব্যবহার দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। একটা বিবেচনা করে দাম রাখ।

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা

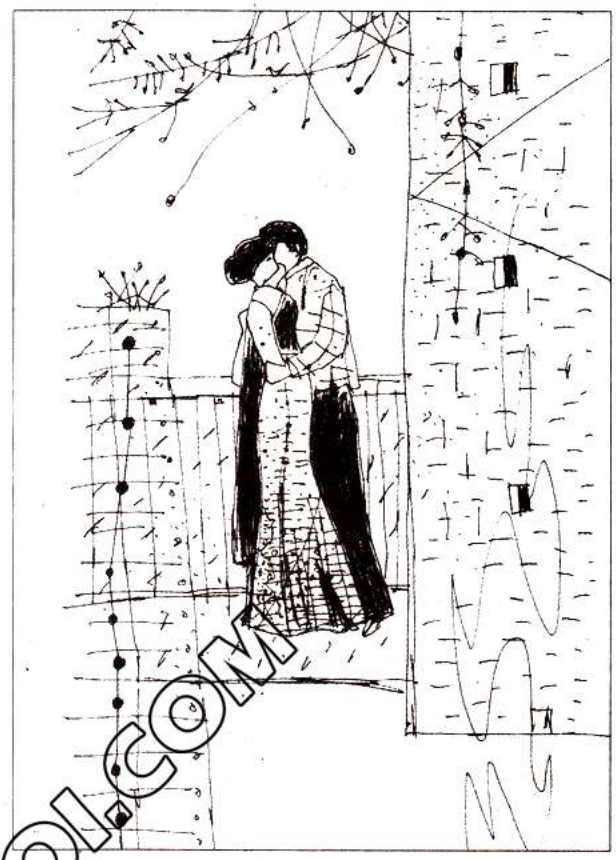

ঠিক আছে স্যার। বলে দোকানের পেছন দিকে গেল ইয়াছিন।

মাছ নিয়ে বাইরে এসে ফরহাদ বলল, তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব, চল।

কোথায় ?

আহা! চলই না!

না, আগে বলো কোথায় ?

ভাজা মাছের দোকানে।

মানে!

মানে আমি তোমাকে এখন এমন একটা দোকানে নিয়ে যাব যেখানে নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছ ভেজে বিক্রি করা হয়। দু'জনে মিলে ভাজা মাছ খাব, চলো। ফরহাদ বলল।

পারভীন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

তুমি ওই দোকানে গেলে বুঝবে আমি পাগল কিনা! এখন চল তো। বলে পারভীনের ডান হাতটি মৃদু স্পর্শ করল ফরহাদ।

ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল দুজনে, ওখানেই দোকান।

তকতকে ঝকঝকে দোকান। গোলাকার টেবিলের চারদিকে সেগুনকাঠের চেয়ার সাজানো। অনেক ভ্রমণার্থী খাওয়ায় রত।

বাইরে জ্বলন্ত চুলায় একটা বিরাট তাওয়া। সেখানে তেল ফুটছে। বাবুর্চি ওই তাওয়ায় মসলা-মরিচ-মাখানো নানা মাছের টুকরা ছেড়ে দিচ্ছে। আওয়াজ উঠছে—ছেঁক ছোঁক।

একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল দু'জনে। পষ্ট চোখে পারভীনের দিকে

AMARBOI.COM

তাকাল ফরহাদ। অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল— অসাধারণ, অপরূপ!

ব্যাখ্যাবিহীন এ শব্দ দুটোর মমার্থ পারভীনের বুঝতে অসুবিধা হল না। মৃদু আবছা একটা হাসির প্রলেপ পারভীনের মুখ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। চাপাস্বরে টেনে টেনে পারভীন বলল, বুড়োর ভীমরতি!

এ নিয়ে আর কথা হল না। দুজনেই মনে করল, এ আনন্দটুকু শুধু নিজেদের হয়ে থাক। চাপা আনন্দকে টেনে প্রকাশের উন্মুক্ততায় দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না দু'জনের। দু'জনের ভেতরে এ আনন্দটুকু গুঞ্জরিত হতে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফরহাদ কথা বলল, আজ তোমাকে এমন একটা মাছ খাওয়াবো, যা তুমি আগে খাও নি।

কী মাছ ?

হোন্দরা মাছ।

কী বললে ? কী মাছ ? ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করল পারভীন।

ওরা বলে হোন্দরা মাছ। ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিকে দেখিয়ে ফরহাদ বলল। আসলে সুন্দরী মাছ। স্থানীয়দের মুখে সুন্দরী হোন্দরা হয়ে গেছে।

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে পারভীন বলল, নারে বাবা, আমার দরকার নেই অপরিচিত মাছ খাওয়ার। শেষে বিদেশ বিভুঁইয়ে কিসে কি হয়ে যায়!

ফরহাদ বলল, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন ? আসলেই সুন্দরী মাছ, কাঁচা সোনার মতন রঙ। লম্বাটে। তবে মুখটা একটু ছুঁচোর মতো।

ওয়াক! এগুলো কী বলছ তুমি! পারভীনের চোখে সুন্দরী মাছের সৌন্দর্যের চেয়ে ছুঁচোর কদাকার মুখটাই ভেসে উঠল বেশি করে।

ফরহাদ দ্রুত বলে উঠল, আহা! তুমি ওরকম করছ কেন ? সবটা শুনোই না আগে। মুখের আকৃতিটা ছাড়া এ মাছের সবটাই ভালো। শরীরের ঠিক মাঝখানে একটি মাত্র কাঁটা। অসাধারণ টেস্ট। কেন জানি না, আমাদের দেশে হাজার কাঁটার ইলিশমাছকে মাছের রাজা বলে মানি—ইলিশমাছ খুব টেস্টি; তুমি আজ সুন্দরী মাছ খেয়ে দেখ, ইলিশের চেয়ে টেস্টি না হলেও মজাতে ইলিশের চেয়ে কম না। যদি না হয়, এক সপ্তাহ তুমি আমাকে হোন্দরা মাছ বলে ডেকো, আমি বেজার হব না।

পারভীন এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, বাহ! বেশ তো রসিয়ে রসিয়ে কথা বলছ তুমি! যেভাবে হোন্দরা মাছের গুণগান করছ, না খেলে পরে আফসোস করতে হবে। দাও অর্ডার, খেয়ে দেখি।

ফরহাদ বেশ উল্লসিত হয়ে উঠল। টেবিলে মৃদু করাঘাত করে উঁচু গলায় বলল, এ্যাই, কে আছো ? এখানে আস।

টেবিলবয় এলে দু'প্লেট সুন্দরী মাছের অর্ডার দিল ফরহাদ, সঙ্গে মিনারেল ওয়াটারের।

অল্পক্ষণের মধ্যে দু'প্লেট ভাজামাছ এল। প্রতি প্লেটে চার পাঁচ টুকরা করে মাছ, লালচে করে ভাজা। মাছের চারপাশে চাকা চাকা পেঁয়াজের টুকরা, কুচিকাটা কাঁচামরিচ পেঁয়াজের ওপর ছড়ানো। ঘনসবুজ ধনেপাতা ভাজামাছের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের ওপর মসলার গুঁড়া হালকাভাবে ছিটানো। প্রতি প্লেটে একটি করে কাঁটা চামচ। একধরনের ম—ম গন্ধ নাকে এসে লাগছে। দেখতে ভালো লাগছে। রসনায় টসটসে রস জমতে শুরু করেছে উভয়ের।

আচ্ছা, তুমি এ মাছ সম্পর্কে জানলে কী করে ? পারভীন জিজ্ঞেস করে।

গত বছর আমার এক কলিগ সপরিবারে সেন্টমার্টিন ঘুরে গেছে। তার কাছ থেকে শোনা। বলতে বলতে একটুকরা ভাজামাছ মুখে তুলে নিল ফরহাদ। নিমীলিত চোখে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করল। তারপর জিহ্বা তালুতে ঠেকিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ তুলল ফরহাদ। বলল, তার বর্ণনার সঙ্গে সুন্দরীমাছের স্বাদ মিলে গেছে। মাছটি সত্যি স্বাদের, কী বলো ?

পারভীন ভাজামাছ চিবোতে চিবোতে বলল, যা শুনেছ, তার সঙ্গে বেশ বাড়িয়ে বলতে পেরেছ তুমি।

ফরহাদ চমকে পারভীনের দিকে তাকাল। খাওয়া বন্ধ করে ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, ভালো লাগছে না ?

হ্যাঁ লাগছে। ভালো না লাগলে কি খেতাম!

উভয়ে খাওয়ায় মন দিল। খাওয়া শেষে টেবিল ছাড়তে যাবে, ওই সময় পারভীন বলল, না খেলে মিস করতাম।

ফরহাদ সোহাগভরা কণ্ঠে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

ব্লু মেরিনের উত্তর দিক জুড়ে প্রশস্ত টানা করিডর। করিডরের দক্ষিণপাশ জুড়ে জুড়ে কক্ষ সংখ্যা দিয়ে কক্ষের পরিচয়—১০১, ৩০৩, ৪০২ ইত্যাদি। পারভীনরা তেতলায় থাকে বলে তাদের কক্ষের নম্বর ৩ দিয়ে শুরু। ৩০৫-এ উঠেছে তারা। কক্ষটি করিডরের শেষ প্রান্তে, সমুদ্র ঘেঁষে। ব্লু মেরিনের চৌহদ্দির ওপাশে ছোট ছোট ঘর, বেড়ার আর টিনের। ঘরগুলো ঘিরে নারকেল গাছ আর নারকেল গাছ। ভ্রমণার্থী শহুরে মানুষগুলোর চোখে ওই ঘনবসতিকে বস্তি বলে ভ্রম হবে। আসলে বস্তি নয় ওগুলো, সমুদ্রনির্ভর মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের নীড়ের সমষ্টি। সমস্ত দিনের সমুদ্রযুদ্ধ শেষে পুরুষেরা সন্ধ্যে ঘরে ফিরে; স্ত্রীরা পথ চেয়ে থাকে তাদের। সন্তানরা জিজ্ঞেস করে, আব্বা কখন ফিরবে মা ? গোসল শেষে দু'মুঠো মুখে দিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহকে বিছানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় তারা, তারপর টানা ঘুম। বিনোদনের তেমন কোনো সুযোগ নেই সেন্টমার্টিনে। বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ নেই তো আকাশ-বিনোদনের সকল পথ রুদ্ধ। কিন্তু এই সমুদ্রগামী মানুষদেরও তো বিনোদন চাই! তাই ওরা বেছে নেয় গান-বাজনাকে। সন্ধে-ঘুমের পর এরা জড়ো হতে থাকে রশিদ বাউলের আস্তানায়। গভীররাত পর্যন্ত চলে গান—দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, বাউল-মুর্শিদি, লালন। ব্লু মেরিনের গা ঘেঁষেই রশিদ বাউলের আস্তানা।

হোটেল-সরবরাহকৃত কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। রুমে রুমে হারিকেনগুলো টিমটিমে আলো ছড়াচ্ছে। বাইরে জোছনার প্লাবন। পারভীন-ফরহাদ করিডরে এসে দাঁড়াল। দেখল, নারকেল গাছের পাতা থেকে জোছনা পিছলে পড়ছে।

রশিদ বাউলকে ঘিরে সুখী-দুঃখী মানুষদের বেড়। একটা উঁচুমতন চৌকিতে বসেছে রশিদ বাউল। মাথায় পাগড়ি। লম্বা দাড়ি বাতাসে এলোমেলো। রশিদ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান করছে, ঢোল বাজাচ্ছে পাশের জন। শ্রোতারা বিভোর। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে তাদের মাথা দোল খাচ্ছে। রশিদ বাউলের সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসছে, দূরত্বের কারণে গানের শব্দগুলো বোঝা যাচ্ছে না।

পারভীন হঠাৎ বলে উঠল, আমি গান শুনতে যাব।

কোথায় ?

ওই, ওইখানে। রশিদ বাউলের আস্তানা দেখিয়ে পারভীন বলল।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! বিপুল বিস্ময় ফরহাদের কণ্ঠে।

না, মাথা খারাপ হয় নি। তুমি কান লাগিয়ে সুরটা শোন, অসাধারণ না ? পারভীন বলে।

হ্যাঁ, শুনতে তো ভালোই লাগছে।

যে সুর শুনতে ভালো লাগে তার কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে করছে কিনা বল।

ইতস্তত ভঙ্গিতে ফরহাদ বলে, হ্যাঁ, শুনতে ইচ্ছে করছে তো।

তাইলে চল, তোমারও শুনতে ইচ্ছে করছে, আমারও শুনতে ইচ্ছে করছে।

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

দু'জনেরই যদি শুনতে ইচ্ছে করে, তাহলে যাব না কেন, বলো! পারভীন উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বলে ওঠে।

কিন্তু এত রাতে! তাছাড়া ওই জায়গার পরিবেশ তো আমাদের জানা নেই। যাওয়া কি ঠিক হবে?

পারভীন বলে উঠল, অবশ্যই ঠিক হবে। রাত হলে কী হবে, আঁধার তো না! জোছনাদেবী আলোর প্রদীপ হাতে নিয়ে গোটা সেন্টমার্টিনে নেমে এসেছেন, দেখছ না! আর পরিবেশের কথা বলছ? এই দ্বীপের দুর্নাম তো শুনি নি কখনো। তাছাড়া, আমরা যেখানে যাব, তা তো সুরের দেশ। সুরের দেশে অসুর তো থাকে না!

ফরহাদ পারভীনের আবেগে ঠান্ডা জল ঢালতে চাইল না। সংগীতের আসর, তার নানা কিসিমের শ্রোতা, অপরিচিত স্থান, জোছনা—সবকিছুকে এখন পারভীন উচ্ছ্বাসের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিচার করছে। স্বামী হিসেবে এই মুহূর্তে ফরহাদের কর্তব্য পারভীনের উচ্ছ্বাসের মূল্য দেওয়া। অনীহাকে ভেতরে চেপে রেখে মুখে খুশি ছড়িয়ে ফরহাদ বলল, ঠিক আছে। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

আমার আবার তৈরি কী! চাদরটা গায়ে জড়াব, মাফলারটা গলায় পেঁচাব। বরং তুমি তোমার গরম জামাকাপড় গা-গলা-মাথায় জড়িয়ে নাও। বলতে বলতে রুমে ঢুকল পারভীন।

ম্যাডাম, কোথায় যাচ্ছেন? থামের আড়ালে স্ত্রীলগ্ন হয়ে দাঁড়ানো হুমায়ুন কবীর ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

পারভীনরা বেশ চমকে গেল। এতরাতে নির্জন করিডরে পুরুষ কণ্ঠ শুনে একটু ভয়ই পেল পারভীন। তাকিয়ে দেখল, হুমায়ুন ছিটকে তার বউ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। বউ আলুথালু বসন ঠিক করতে ব্যস্ত। ফরহাদ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পারভীন মুচকি হেসে বলল, গান শুনতে।

গান শুনতে? কোথায় ম্যাডাম? ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হুমায়ুন।

শুনতে পাচ্ছ না, গানের সুর ভেসে আসছে! পারভীন বলল।

ম্যাডাম, আমরাও যাব আপনার সঙ্গে। কী বলো শিউলি, যাবে না?

থামে ঠেস দেয়া জবুথবু শিউলি সম্মতির মাথা নাড়ল।

তোমাদের না গেলে হয় না! মৃদুকণ্ঠে বলল পারভীন।

না ম্যাডাম, আমরা যাব। এই শিউলি, তুমি কিছু বলছ না কেন?

কথাটা ধমকের হলেও এক দলা সোহাগ হুমায়ুনের গলা দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে এল বলে পারভীনের মনে হলো। শিউলি আর কী বলবে? এই সেদিন বিয়ে হয়েছে। লজ্জা এখনো তাকে ছেড়ে যায় নি। কণ্ঠে এবং আচরণে তা টের পাওয়া গেল। মাথা নিচু করে গায়ে বুকে ভালো করে ওড়না জড়াতে জড়াতে নিচুস্বরে শিউলি বলল, অ্যাঁ-হ্যাঁ ম্যাডাম, আমিও গান শুনতে ভালোবাসি।

আচ্ছা, যেতে চাইছ যখন, চল। বলে পা বাড়াল পারভীন সামনের দিকে। হুমায়ুন আর শিউলি তাকে অনুসরণ করল।

দোতলায় নামতেই জাফর আহমদের সঙ্গে দেখা। সিঁড়ি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ধুমসে সিগারেট টানছিলেন। সিঁড়ির সঙ্গে লাগোয়া রুমটা তাঁর জন্যে বরাদ্দ হয়েছে। ভেতরে এক খাটে স্ত্রী ছয় বছরের কন্যাকে নিয়ে শুয়েছেন, অন্য খাটে জাফর আহমদ, একা। মেয়েটা দীর্ঘরাত পর্যন্ত জেগে ছিল, মেয়েকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে স্ত্রীও ঘুমিয়ে গেছেন একসময়। মনে উসখুসানি নিয়ে জাফর সাহেব দীর্ঘক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছেন। একসময় স্ত্রীর মৃদু নাক ডাকার শব্দ কানে এলে হঠাৎ সিগারেট খাওয়ার তীব্র তৃষ্ণা জাগল জাফর সাহেবের। বদ্ধ ঘরে সিগারেট খাওয়াকে সমীচীন মনে করলেন না তিনি। প্যাকেট নিয়ে বাইরে এলেন। করিডরে দাঁড়িয়ে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন। কখন ফরহাদ পাশ

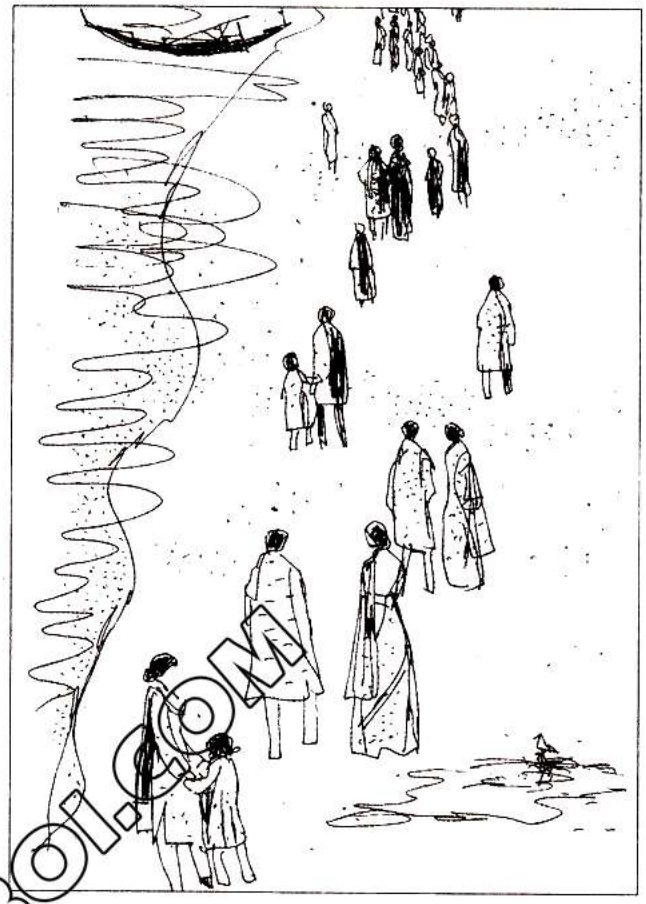

দিয়ে নেমে গেছে খেয়াল করেন নি তিনি। হয়তো একজনের পদধ্বনি বলে তাঁর কানে পৌঁছায় নি। কিন্তু তিনজনের সম্মিলিত পায়ের আওয়াজ জাফর আহমদের কানে গেল। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—তিনজন, তার মধ্যে দুজন নারী আর একজন পুরুষ, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। পারভীনকে চিনতে পারলেন জাফর সাহেব। অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, পারভীন আপা না? কোথায় যাচ্ছেন এত রাতে? কোনো বিপদ-আপদ হয় নি তো?

পারভীন হাসতে হাসতে বললেন, এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে উত্তর দিই কী করে জাফর সাহেব! ফকফকা জোছনা পারভীনের মুখ জুড়ে। গলা থেকে নিচের অংশটা করিডরের আঁধারে ঢাকা। এই সময় পারভীনকে অলৌকিক জগতের মানুষ বলে মনে হল জাফর সাহেবের। আলো-আঁধার, পারভীন, তার পেছনে দু'জন নিশ্চুপ মানুষ, গভীর রাত, ঝিঁঝি পোকার অবিরাম শব্দ, বাউল-আস্তানার গানের মৃদু তরঙ্গ—এসব কিছু জাফর সাহেবের চারদিকে একটি অলৌকিক জগৎ তৈরি করল। তিনি কিছু সময়ের জন্যে সংবিৎ শূন্য হয়ে পড়লেন।

জাফর সাহেবের এরকম অবস্থার কথা পারভীন টের পেল না। অপর দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে পারভীন আবার বলল, কই, কিছু বলছেন না যে জাফর সাহেব? পারভীনের কণ্ঠটি স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু।

জাফর সাহেব বাস্তবে ফিরে এলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছেন আপা?

পারভীন জাফর সাহেবের অন্যমনস্কতার কারণ খুঁজে পেল না। ইতস্তত করে বলল, আপনি জানতে চাইছিলেন কোথায় যাচ্ছি? যাচ্ছি গান শুনতে। তারপর হালকাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, যাবেন নাকি?

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

যাব মানে, যাবই তো। চলেন, চলেন আপা।

কী আশ্চর্য! আপনার স্ত্রীকে বলে যাবেন না ?

বাহির থেকে দরজায় পেডবলটা টেনে দিতে দিতে জাফর সাহেব বললেন, বলতে হবে না। সারাজীবন ঘুমের ডাকেই সাড়া দিয়ে গেল রাবেয়া। বলেই অন্ধকারে জিহ্বায় কামড় দিলেন জাফর সাহেব।

যা বোঝার পারভীন বুঝে গেল। মুচকি হেসে বলল, চলেন।

প্রথমে পারভীন, পরে জাফর সাহেব, তার পিছু পিছু হুমায়ুন-দম্পতি সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে না নামতেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে ফরহাদ বলে উঠল, তেতলা থেকে নামতে এতক্ষণ লাগে ? পরে বলল, কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

পারভীন ফরহাদের কণ্ঠের উষ্ণতা টের পাওয়া সত্ত্বেও সংযত গলায় বলল, দোতলায় জাফর সাহেবের সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেল।

জাফর সাহেবের নাম শুনেই ফরহাদের মধ্যে রাগ খলবলিয়ে উঠল। মুখের ভেতরটা তেতোতে ভরে গেল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে কী যেন বলতে গিয়ে জাফর সাহেবের ওপর চোখ পড়ল ফরহাদের। ক্ষোভটাকে প্রবল চেষ্টায় ভেতরে দাবিয়ে রাখল। কিন্তু তার ভাবান্তর জোছনার আলোতে দেখতে পেল পারভীন। পরিবেশটাকে সামাল দেওয়ার জন্যে উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে পারভীন বলে উঠল, জাফর সাহেবও যেতে চাইলেন আমাদের সঙ্গে, আমি বললাম—চলেন।

ফরহাদ একটি শব্দও না করে সামনের দিকে পা বাড়াল। মনে মনে গরজাতে লাগল ফরহাদ—হারামজাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁজা খাচ্ছিলি, খা। আমাদের পিছু নিলি কেন ? আমাদের প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ কেন শালা! তোর জন্যে কি হারামখোর আমরা স্বামী-স্ত্রী একান্তে ঘুরতেও পারব না ? জাফর সাহেব ছাড়াও যে তাদের সঙ্গে হুমায়ুন-দম্পতি আছে—তা রাগের কারণে ফরহাদের মাথা থেকে ছুটে গেছে। অথবা অপছন্দের জাফর সাহেবের তাদের সঙ্গে যাওয়ার উদ্যোগে মনটা এমন বিষিয়ে উঠেছে যে হুমায়ুন-দম্পতির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চাইছে ফরহাদ। যাই হোক, পারভীন থেকে দু'কদম এগিয়ে থেকে ফরহাদ রশিদ বাউলের আস্তানায় পৌঁছাল।

আস্তানায় পৌঁছেই সবার মন ভালো হয়ে গেল। স্ত্রীসঙ্গ বঞ্চিত জাফর সাহেবের মানসিক ও শারীরিক অস্বস্তি কেটে গেল। শিউলির জড়তা কেটে গেল, হুমায়ুনের উচ্ছলতা বেড়ে গেল।

ফরহাদের কথা আর আচরণে পারভীনের মনে যে দুঃখ জমা হয়েছিল, তা উবে গেল। সর্বোপরি ফরহাদের জটিল মনের পেঁচানো গ্রন্থির জট একেবারে খুলে গেল।

তারা সবাই রশিদ বাউলের সামনে বিছানো ফরাশে বসে পড়ল। উপস্থিত শ্রোতারা বনেদি মানুষ দেখে একটু নড়েচড়ে বসল। রশিদ বাউল একটু মাথা ঝোঁকাল। বাউল তখন গাইছে—

তোর প্রেমে জ্বইলা পুইড়া ছাই প্রাণ বন্ধুয়ারে।
প্রাণ বন্ধুরে, তোর প্রেমের ফান্দে পড়ি
আছাড় ধাছার খাইয়া মরি,
যৌবনকালে তোমারে না পাই।
মাতা পিতা ত্যাজ্য করি
আইলাম বন্ধু তোমার বাড়ি,
তুমি নাকি গিয়াছ লুকাই।

এতটুকু গাওয়ার পর পূর্বতন শ্রোতারা আ হা হা জাতীয় একটা শব্দ করে উঠল। রশিদ বাউল অবিচলভাবে গেয়ে যেতে লাগল—

প্রাণ বন্ধুরে, যৌবন থাকতে হইলাম রাড়ি
কেমনে ছাড়ি বাপের বাড়ি
পাড়ার লোকে আড়ে ঠাড়ে চায়।
প্রাণ বন্ধুরে আম গাছে আম ধরে
পাকিলে সে ঝরে পড়ে,
কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ধরে
বনের পাখি আহার করে
আমার পাকনা কাঁঠাল গাছেতে শুকায়।

গান শেষ হলে অভ্যস্ত শ্রোতারা মারহাবা মারহাবা বলে উঠল। পারভীনরা জানে না বাউল আস্তানার নিয়মকানুন। গান শেষে যে এখানে বিশেষ শব্দ যোগে ধ্বনি দিতে হয় এটা নতুন আগতরা জানে না। একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল পারভীনরা। হঠাৎ করে হুমায়ুন হাততালি দিয়ে উঠল। তার দেখাদেখি উপস্থিত সবাই হাততালি দিতে লাগল। রশিদ বাউল মাথা ঝুঁকিয়ে বারবার আদাব জানাতে লাগল।

এরপর পারভীনদের অনুরোধে রশিদ বাউল কয়েকটি লালনগীতি, হাছান রাজার গান গাইল। গভীর রাতে আসর ভাঙল। মনের সকল বিষাদকে রশিদ বাউলের আস্তানায় জমা রেখে হোটেলে ফিরল পারভীনরা। ■

AMARBOI.COM

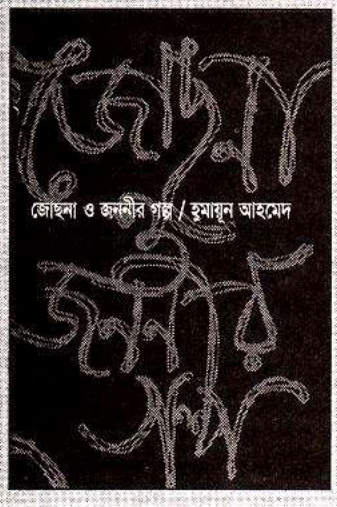

কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের অনন্য সৃষ্টি, মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশাল ক্যানভাসের উপন্যাস

জোছনা ও জননীর গল্প

অন্যপ্রকাশ ৩৮/২ ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২, ০৭১৭৬৯১৫৪৭১